বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্ক

ওবেইদ জাগীরদার

বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্ক

ওবেইদ জাগীরদার

বস্তু প্রকাশন
৬৮/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

www.pathagar.com

বস্তু- ৫১

বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্ক
ওবেইদ জাগীরদার

প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট, ১৯৯৭।

প্রকাশক
বস্তু প্রকাশন
৬৮/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
ফোন : ৯৫৫৭৪৯৭

মুদ্রণ
বার্ণিক প্রিন্টার্স
বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা।

পরিবেশক
তক্ষশীলা
৪১ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা।

স্বত্ব : লেখক

দাম: ৬০ টাকা
(বিদেশে ৫ ইউ.এস. ডলার)

Bangladesh Pashchimbanga Shamparka
by **Obeid Jagirdar**, Bastu Prakashan, 68/2 Purana Paltan, Dhaka, 1st Edition, August, 1997. Price: Tk. 60 ($5 abroad)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অঁরিয়েতকে

যার কাছে আমি চিরঋণী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গক্রম

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনীতি প্রমাণ করে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙালিরা কতটা পিছিয়ে আছে। আর, বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্ক থেকে বোঝা যায় বাঙালি জাতি কতটা দূর্ভাগা। ১৭৫৭ সালে আত্মকলহের ফলেই বাঙালি স্বাধীনতা হারায়। শ' দেড়েক বছর পর বিদেশীরা দেশটাকে দু'ভাগ করে ফেলে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেলেও ব্যবধানটা থেকেই যায়, তার রাজনৈতিক রূপদানের কাজটা বাকী ছিলো শুধু, যা সম্পন্ন হয় ১৯৪৭ সালে। ১৯৭১ সালের পর আশা করা হয়েছিলো পরিস্থিতি বদলাবে। বাস্তবে তা হয়নি। বরং পরবর্তী দু'দশকে গজিয়ে ওঠা বিদ্বেষের পটভূমি তৈরি হয়েছিলো ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের বিরাজমান সম্পর্কের সূত্রেই।

এই দু'টি দেশের সম্পর্কের এ টানাপোড়েন বুঝতে হলে বিষয়টিকে রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিত থেকে বিচার করতে হবে। তেমনি, শুধু বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখলেই চলবে না, আমাদেরকে ইতিহাসের দিকে—শশাঙ্কের কাল, এমনকি খ্রিস্টের জন্মের আগের সময় পর্যন্ত ফিরে তাকাতে হবে। কারণ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান তিক্ত সম্পর্ক একযুগ বা একশ' বছরে সৃষ্টি হয়নি, এর জন্ম বহু আগে—সেই আর্য আগ্রাসনের যুগে। আর্যরা এ দেশে নানা উপায়ে আর্যায়নের চেষ্টা চালালে প্রথমবারের মতো বাঙালি জনগোষ্ঠী আর ইতোমধ্যে জায়গা করে নেয়া আর্য শাসকগোষ্ঠী ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। এর ফলে প্রাচীন যুগে যে বিরোধ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিলো তার বাইরের প্রকাশটা ছিলো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক। বাংলায় ইসলামের প্রসার এবং মুসলিম বিজয়াভিযানের ফলে তা আরো ঘনীভূত হয়। ধীরে ধীরে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় যথাক্রমে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য সৃষ্টি হলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিরোধটি কিছুটা আঞ্চলিক রূপ পায়। এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কের বর্তমান পরিস্থিতি।

১৯৪৭ সালে পাক-ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ও তার অপরাংশ অর্থাৎ ভারতের অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বাংলা বিভাগের সমালোচনা করা হয়েছে নানা দিক থেকে।

www.pathagar.com

এখনো চলছে এসব আলোচনা। তবে বাংলা বিভাগ এবং দুই বাংলার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এই আলোচনার সবটুকুই বুদ্ধিজীবী মহলে সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে সাধারণের মধ্যে তেমন আগ্রহ বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে দেশের 'পরিচালক' পদে আসীনদের মধ্যেও তা তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক ক্রমশ: জটিল হচ্ছে।

কিন্তু আমরা অনেকে এখনো পুরনো স্মৃতিতে আক্রান্ত ও প্রভাবিত। পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে অসংখ্য বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনের নিবিড় সান্নিধ্যে ভাবি ওটাও আমাদের দেশ ছিলো। একই ভাষা, একই আচার প্রথার একদল মানুষের মাঝখানে পড়ে প্রায়ই ভুলে যেতে ইচ্ছে করে যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা দু'টি দেশের বাসিন্দা।

কিন্তু বাস্তবে একই ভৌগোলিক, ভাষিক ও নৃতাত্ত্বিক এবং প্রায় একই সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা একটি জনগোষ্ঠী আজ দু'ভাগ হয়ে পরস্পর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ তাদের প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের সাথে যে সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতার সম্পর্ক ভোগ করে, বাঙালির কপালে তাও নেই।

এই যে বিশাল ব্যবধান, একই জাতির দুটি (কৃত্রিম) অংশের মধ্যে এই যে জটিলতা তার বীজ, শিকড়বাকর ও বৃদ্ধির প্রকৃত রূপটা বোঝা এবং সে ব্যবধান ও জটিলতা সম্পূর্ন নিশ্চিহ্ন করা বা কমিয়ে আনার সমস্যা ও সম্ভবনা নিয়েই এ গ্রন্থভূক্ত নিবন্ধগুলো লেখা। বিশ শতকের শেষ দশকে এসে আমরা পৃথিবীতে নানা পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছি, করছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভাগ হয়ে যাওয়া জার্মানী আবার এক হয়েছে। অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যের অভিযোগ ছাড়া জার্মানী এখন পর্যন্ত বড় কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। আবার, দীর্ঘদিন এক রাষ্ট্র হিসেবে থেকেও চেক প্রজাতন্ত্র ভাগ হয়ে গেছে, মর্মান্তিক ফলাফল নিয়ে ভেঙ্গেছে যুগোশ্লাভিয়া। এইসব অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নেয়ার আছে।

এখানে বিনয়ের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান কালে কোলকাতার সাময়িকী "উপকণ্ঠ"-এর সম্পাদকদ্বয় প্রণব বিশ্বাস ও কুমারেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যার জন্য আমাকে উপর্যুক্ত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখার অনুরোধ জানান।

কুমারেশ ও প্রণব মহাশয়ের আন্তরিক আগ্রহ এবং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি নিবন্ধের ছক মনে মনে তৈরি করি। এর কয়েক মাস পর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমি ও

www.pathagar.com

সরকারের নতুন নতুন উদ্যোগের কারণে এই প্রসঙ্গটি আমাদের সমাজ ও রাজনীতিতে আলোচিত হতে থাকে।

এ কাজে হাত দিয়েছিলাম উপকণ্ঠের জন্য। শুরু করতে গিয়ে মনে হলো বিষয়টি খুবই গভীরে প্রোথিত, বিস্তৃত তো বটেই; একটি নিবন্ধে এ সম্পর্কিত যাবতীয় প্রসঙ্গ শুধু স্পর্শ করে যাওয়াও সম্ভব নয়। এ চিন্তা থেকেই "বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্ক" গ্রন্থের কাজ শুরু করি।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এবং গ্রন্থাকারে মুদ্রিত বহু লেখা আমি মন দিয়ে পড়েছি। তা থেকে দু'টো বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। একটি এই যে, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক যে অনেকাংশে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল সে সত্যটি উপরোক্ত লেখাসমূহে কোনো প্রভাব ফেলেনি। অন্য একটি রূঢ় উপলব্ধি হলো—কোনো কোনো লেখায় বাস্তব তথ্যগুলোকে ভুলভাবে বা বিকৃত করে অথবা বাড়িয়ে উপস্থাপন করার ফলে তার প্রতিক্রিয়াতেও বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্ক তিক্ত হচ্ছে। আমি আমার লেখাতে এ দু'টো বিষয়ও যাচাইয়ের চেষ্টা করেছি।

ওবেইদ জাগীরদার
ঢাকা, ৩০ জুলাই, ১৯৯৭।

www.pathagar.com

সূচী

ইতিহাস ও রাজনীতির দেয়াল	১৩
ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা	৩৭
ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক	৬৯
প্রচার মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়	৮৫
গ্রন্থপঞ্জী	৯৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইতিহাস ও রাজনীতির দেয়াল

এ যাবত আমাদের যে ইতিহাস আমরা পেয়েছি তা আমাদের জানিয়েছে যে, বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম প্রত্যক্ষ হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ দেখা দেয়। এ বর্ণনা ইতিহাসের আংশিক সত্য বিবৃত করে। এবং ইতিহাসের কিছু সত্য গোপনও করে রাখে। কারণ, প্রথমত, মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত ছিলো আসলে ক্ষমতাবান হিন্দু ও ক্ষমতাবান মুসলমানদের দ্বন্দ্ব, শাসকচক্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি বিশেষ রূপ মাত্র। এর সাথে শোষিত শ্রেণীর হিন্দু বা মুসলমানরা জড়িত ছিলো না। সুতরাং একে কোনোমতেই সাধারণ মানুষের সাম্প্রদায়িক সংঘাত বলে চালিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তবে যে সব বাঙালি ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করে মুসলমান হয়েছিলো তাদের সাথে প্রাক্তন ব্রাহ্মণ প্রভুদের ছোটো খাটো সংঘর্ষ বরাবরই লেগে ছিলো। এতে নির্যাতিত সাধারণ হিন্দুরা অংশ গ্রহণ করেনি। তা করলে অষ্টম-নবম শতক থেকে এদেশে ইসলাম প্রচার সম্ভব হতো না। কাজেই নতুন মুসলমানদের সাথে ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর সংঘাতটাকে একধরণের শ্রেণী সংঘাত বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। একদিকে, ব্রাহ্মণরা তাদের পুরোনো ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সাম্যবাদী(তখন পর্যন্ত) ইসলামের প্রসার রোধ করতে চাচ্ছিলো। অন্যদিকে, বাঙালিরা ইসলাম গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবনযাপনের অধিকার অর্জনের চেষ্টা করছিলো।

বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পর মুসলমানদের সংখ্যা, সাহস ও শক্তি বাড়ে। ফলে এ সংঘাতের বিস্তৃতি ঘটে। এবং সাধারণ মুসলমানদের সংগ্রাম

www.pathagar.com

কখনো কখনো, একটি বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত, মুসলমান শাসকদের পক্ষে যায়, যেহেতু তাদের দুপক্ষেরই শত্রু ছিলো ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা।

এ বিরোধের সূত্র এবং কারণগুলো আরো অনেক প্রাচীন। মুসলমানদের আগমণের অনেক আগেই বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বিভাজন দেখা দিয়েছিলো। সে বিভাজনের কারণ হলো আর্যদের আগ্রাসন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর ব্রাহ্মণদের অমানবিক নির্যাতন। দশ শতকের পর থেকে ইসলামের প্রসারের ফলে নির্যাতিতদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মনে আর্য হিন্দু ও ব্রাহ্মণদের প্রতি যে ক্ষোভ ছিলো তা কিন্তু দূর হয়ে যায়নি। বরং মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পর তারা ব্রাহ্মণদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ভিত খুঁজে পায়। এবং এভাবে আর্য ও অনার্য তথা বাঙালি বিরোধে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। প্রজন্মক্রমে নির্যাতিত অনার্যদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করে আর্য-বাঙালি বিরোধকে 'আর্য-মুসলমান' তথা 'হিন্দু ব্রাহ্মণ ও হিন্দু সামন্ত শক্তির সাথে মুসলমানের বিরোধ'-এ রূপ দেয়। এ বিরোধকেই উনিশ শতকের সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ সংঘাত হিন্দু-মুসলিম সংঘাত ছিলো না। কারণ সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রায় সবাই সে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করলেও সাধারণ হিন্দু জনগণ তাতে অংশ নেয়নি। শুধু ব্রাহ্মণ ও হিন্দু রাজ-রাজড়ারাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েছে।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি তার কারণ ওরাও ছিলো নির্যাতিতদেরই সমগোত্রীয়। পার্থক্য ছিলো এইটুকু যে, একটা নতুন ধর্মমতকে আলিঙ্গন করার মতো মানসিক জোর তাদের আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ফলে এরা হিন্দু ধর্মের মধ্যেই থেকে যায়। সাধারণ হিন্দুরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি তার বড়ো প্রমাণ এই যে, প্রথম দিকে অল্প সংখ্যক মুসলমানই ইসলামের প্রচারে বিরোধ-সংঘাতের মোকাবেলা করেছে। সাধারণ হিন্দু জনগণ বাধা দিলে তা সম্ভব ছিলো না। সাধারণ হিন্দুরা হয়তো মুসলমানদের সংগ্রামকে মনে মনে সমর্থন করেছে এই ভেবে যে, এতে অন্তত ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

বস্তুত: মধ্য যুগের যে সংঘাতকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তার অনেকখানি এসেছে আর্য-বাঙালি বিরোধের প্রাগৈতিহাসিক ধারা থেকে। একটা সময় আর্যত্ববাদী বাঙালি পন্ডিতরা বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে যথাক্রমে আর্য জাতি, সংস্কৃত ভাষা ও আর্য সংস্কৃতির পরিবর্তিত-বিকৃত রূপ হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দেশী বিদেশী বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বাঙালি জাতির মৌলিক পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করায় আর্যত্ববাদীদের সে চেষ্টা দূর হয়েছে। বাঙালির শরীরের বিভিন্ন অংশের গড়ন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করার পর এ নৃ-তাত্ত্বিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বাঙালি ও আর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি জাতি।[১] একইভাবে, 'বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা' এ কাব্যিক উপমাটিও পরিত্যক্ত হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ইতিহাস আবেগ ও কল্পনায় আচ্ছন্ন ছিলো। সত্য খন্ডিত ছিলো এবং কোথাও কোথাও মিথ্যাচার সত্যকে আড়াল করে বহুদিন টিকে ছিলো। এ কারনেই আমরা জেনেছি বাংলাদেশে মধ্যযুগ থেকেই হিন্দু-মুসলিম সংঘাত চলে আসছে, জেনেছি আমাদের সংস্কৃতি আসলে আর্য সংস্কৃতিরই বিকৃত রূপ। সন্দেহ নেই, এই মিথ্যাচারের শিকড় অনেক গভীরে। তাই প্রকৃত সত্য জানার জন্য আমাদের গোড়ার ইতিহাসটাও একবার দ্রুত দৃষ্টিতে দেখে নেয়া উচিত।

আজ পর্যন্ত যতটুকু নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষিক উপাদান পাওয়া গেছে তাতে বাংলাদেশে মানব সভ্যতার বিকাশের প্রাচীনতম ইতিহাস বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। তবে পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকায় মানব সভ্যতার বিকাশ, বিভিন্ন গোত্রের স্থানান্তরে বসতি স্থাপন এবং এর ফলে সংঘটিত পরিবর্তন বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন পন্ডিতরা। তাদের আবিষ্কৃত তথ্যাবলী বাংলাদেশের প্রাগৈতিহাসিক মানব বসতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এসব প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এটুকু জানা গেছে যে, আজ থেকে চার হাজার বছর আগেও বাংলাদেশে লোক বসতি ছিলো এবং ওরাই হয়তো এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা। বাংলাদেশের এই আদি বাসিন্দাদের 'ভেড্ডিড' বা 'আদি অষ্ট্রেলীয়' বলা হয়।

১। নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষেপিত সংস্করণ,

www.pathagar.com

বর্তমান কোল, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, মালপাহাড়ী প্রভৃতি গোত্রগুলো ভেড্ডিডদের প্রায় বিশুদ্ধ বংশধর। ওরা নিজেদের সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো। তাদের মধ্যে নিজস্ব ভাষায় গান, নাচ ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের চর্চা ছিলো যা কিছুটা বিকৃত অবস্থায় আজো টিকে আছে। চাষবাস, লাঙ্গলের ব্যবহার, ঢেঁকির আবিষ্কারসহ বাঙালি জাতির বর্তমান সংস্কৃতির বিরাট এক অংশ তার ভেড্ডিড পূর্বপুরুষের দান।[১]

বেশিরভাগ নৃ-তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকের ধারণা পামির ও টাকলামাকান অঞ্চলের আলপাইনীয় নামের মানবগোষ্ঠী প্রাগৈতিহাসিক কালে ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে।[২] তখনই ওদের একাংশ এদেশে আসে। আলপাইনীয়দের ভাষা আর্য ভাষা-গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত হলেও এরা ভারতে আগত আর্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৩] বাংলার আদি বাসিন্দা ভেড্ডিডদের সাথে আলপাইনীয়দের মিশ্রণ ঘটেছিলো। এ দু'টো মানবগোষ্ঠীর সাথে বাঙালির বর্তমান শারীরিক গঠনের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এ ছাড়া দ্রাবিড়ভাষী আদি ভারতীয়দের সাথেও বাংলার ভেড্ডিডদের মিশ্রণ ঘটেছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায় বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে। তবে অনেকে দ্রাবিড়ভাষী মানবগোষ্ঠীটিকে ভেড্ডিডদেরই আরেকটি দূরবর্তী শাখা বলে মনে করেন।[৪] দ্রাবিড়ভাষী শাখাটির উপাদান আমাদের দেশের বহু মানুষের মধ্যে এখনো বিদ্যমান। বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি দ্রাবিড়দের ভাষা ও সংস্কৃতি কর্তৃক বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলো।

এর পর এ অঞ্চলের মানুষদের সাথে কিয়ৎ পরিমাণে মঙ্গোল রক্তের মিলন ঘটে। এভাবে, পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে, আর্যদের আগমনের বহু আগেই বাঙালি জাতি নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্বয়ম্ভু ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এর সমর্থক প্রমাণ পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর তীরবর্তী কয়েকটি স্থানে এবং ঢাকার সংলগ্ন নরসিংদী জেলার বেলাবো থানায় প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত

১। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, পৃ ১২-১৪।

২। Rama Prasad Chanda, *The Indo Arayan Races*, p.-75.

৩। *এবনে গোলাম সামাদ*, নৃতত্ত্ব।

৪। নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ-২।

www.pathagar.com

হওয়ার পর। পশ্চিমবঙ্গে অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর তীরে পাওয়া গেছে প্রাচীন মানুষের ঘরবাড়ির চিহ্ন, কিছু মাটির পাত্র এবং একটি সীল। ওখানে পাথর বা ইটের ভিতের ওপর তৈরী ঘরের ছানি হিসেবে শন, পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছিলো বলে অনুমান করা হয়। পন্ডিতদের ধারণা আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছরেরও আগে সিন্ধু সভ্যতার কাছাকাছি সময়ে ওখানে একদল সভ্য মানুষ বসতি গড়েছিলো।[১] আর্যরা তখনো উত্তর ভারতে প্রবেশ করেনি।

বেলাবোতে পাওয়া গেছে বিভিন্ন স্তরের প্রত্ন বস্তু—মৌর্যদের কাছাকাছি সময়ের ছাপাংকিত রৌপ্যমুদ্রা, এরও আগের মানুষের ব্যবহৃত মাটির ও তামার পাত্র, দামী পাথরের গুটিতে তৈরী মালা, লোহার কুঠার ইত্যাদি। সরকারী উপেক্ষা এবং বাংলাদেশী পন্ডিতদের অনীহার কারণে বেলাবোতে বিশেষ কোনো খনন কাজ চালানো হয়নি, প্রাপ্ত প্রত্ন-বস্তুগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়নি। তবে যারা এ নিয়ে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে গবেষণা করেছেন তারা বলেছেন বেলাবোর প্রত্নবস্তুসমূহের অনেকগুলি প্রাগৈতিহাসিক কালের হওয়ার সম্ভবনাই বেশি।[২]

রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকেও যে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন, সভ্য দেশ ও জাতি হিসেবে বিকশিত হচ্ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া গেছে আর্য-হিন্দুদের পুরাণ-মহাভারতেই। 'সেখানে বঙ্গ দেশ ও বঙ্গবাসীদের স্বাতন্ত্র্যের কথ বলা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে বিদ্বেষপ্রসূত মন্তব্যও করা হয়েছে। বঙ্গ শব্দের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় "ঐতরেয় আরণ্যকে"। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" ও "মানবধর্মশাস্ত্রে" পুন্ড্র জাতির উল্লেখ আছে।'[৩] এই পুন্ড্র জাতি পুন্ড্রবর্ধন অর্থাৎ বর্তমান বগুড়া-রাজশাহী-রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে বাস করতো। মনু সংহিতায় আছে :

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুন: সংস্কারমর্হতি।[৪]

১। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ* পৃ: ১২-১৪।
২। মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, *প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: উয়ারী-বটেশ্বর,* পৃ ১৩-১৪।
৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস,* পৃ ১৮-২২।
৪। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা,* পৃ ২৮।

www.pathagar.com

শ্লোকটির অর্থ হলো, তীর্থ যাত্রা ছাড়া অন্য কোনো কারনে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মগধ প্রভৃতি দেশে গেলে (তাকে) অবশ্যই সংস্কার (প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ) করতে হবে (নতুবা সে সমাজচ্যুত হবে)। শতপথব্রহ্মণে আছে যে, অগ্নি সরস্বতী তীর থেকে সরযূ, গন্ডকী ও কুশি নদী পার হয়ে সদানীরা (অর্থাৎ করতোয়া) নদীর তীর পর্যন্ত এসেছিলেন, কিন্তু আরো দক্ষিণে মগধ বা বঙ্গ দেশে যাননি (অর্থাৎ এর পরে আর কোনো এলাকা দখল করতে পারেননি। বোঝাই যাচ্ছে করতোয়া নদীর এপারের অধিবাসীরা আর্য-আগ্রাসন রুখে দিয়েছিলো)। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে বঙ্গ ও বঙ্গবাসীদের উল্লেখ এবং দেশটি সম্পর্কে তাদের বিদ্বেষ থেকে বোঝা যায় সে সময়ে আর্যরা বাংলাদেশ দখল করতে পারেনি।

স্বাধীন, সার্বভৌম অনার্য বাংলাদেশ ও তাদের অনার্য অধিবাসীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সবচয়ে বড় প্রমাণ আছে আলেকজান্ডারের কাছাকাছি সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দির গ্রীক পন্ডিত প্লিনীর বর্ণনা অনুযায়ী "গংগা নদীর শেষভাগ যে এলাকার ভিতর দিয়ে দক্ষিণপ্রবাহী হয়ে সাগরে পড়েছে , সে এলাকাই গংগারিড়ির বংগ রাজ্য" [১] । দ্বিতীয় শতকের ভৌগলিক টলেমী লিখেছেন, "গংগা মোহনার সব অঞ্চল জুড়েই গংগারিড়ি (জাতি) বাস করে।"[২] অন্যান্য গ্রন্থেও গঙ্গা অর্থাৎ পদ্মার শেষভাগের দু'দিকে বসবাসকারী এক স্বতন্ত্র, সমৃদ্ধ জাতি এবং তাদের স্বাধীন, শক্তিশালী রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। যুদ্ধে, ব্যবসায়, সামগ্রিক সমৃদ্ধিতে ভারতের অন্যান্য জাতিগুলোর তুলনায় এ জাতির মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন ঐ সময়ের গ্রীক ঐতিহাসিকগণ। এসব সাক্ষ্য থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকেও বাংলাদেশের স্থানীয় অধিবাসীরা ছিলো স্বাধীন, সভ্য, উন্নত এক জাতি এবং আর্যদের তুলনায় বেশি শক্তিমান।

আমাদের মনে স্বভাতই প্রশ্ন জাগে এমন একটি সমৃদ্ধ জাতির ইতিহাস কি করে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। অথচ এর বহু আগের আর্য ইতিহাস

১। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ ৩-৪।

২। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ ৪।

www.pathagar.com

'রয়ে গেছে। দক্ষিণ ভারতে আদিবাসীদেরও কিছু ইতিহাস পাওয়া গেছে। শুধু সে সময়ের বাঙালি জাতি ও তাদের রাষ্ট্রের কোনো চিহ্ন এ যাবত আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই এ সন্দেহ অমূলক নয় যে, আর্য রাজশক্তি বিশেষত গুপ্ত শাসকগণ ও শশাঙ্কের সময়ে ব্রাহ্মণদের আগ্রাসনের মুখে সে সব ধ্বংস হয়ে যায়।

বাংলায় ঠিক কখন, কিভাবে আর্যদের আগ্রাসন শুরু হয় তার সঠিক দিন ক্ষণ নির্দেশ করার মতো তথ্য প্রমাণ নেই। উপরোক্ত সুত্রগুলো থেকে এটুকু জানা যায় যে, উত্তর ও মধ্য ভারতে আর্যদের দখল পাকাপোক্ত হওয়ার আরো অনেক পরে তারা বাংলায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

আর্য হিন্দুরা বাংলায় আসার পূর্বে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যে এখানে বিশেষ বিস্তার লাভ করেছিলো তারও প্রমাণ পাওয়া যায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে। আর্যদের হাতে বাংলার সম্পূর্ণ পতনের বহু আগেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম এ দেশের মানুষদের দুটি প্রধানতম ধর্মে পরিণত হয়।[১] গুপ্তবংশ ক্ষমতায় আসার প্রাক্কালে সারা বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ঐ সময়ে নির্মিত অসংখ্য বিহার, চৈত্য ইত্যাদি তার প্রমান ।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা গেছে খ্রি. পূ. তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতকে মৌর্যদের কিছু প্রভাব পড়েছিলো উত্তরবঙ্গে। সে সময় এখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে হিন্দু ধর্মের প্রচার হয়। আবার গ্রীক ইতিহাসের সুত্রে দেখা যাচ্ছে খ্রিষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেও বাংলার আদি জাতি ও বঙ্গের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিলো। এ থেকে এটুকু বোঝা যায় যে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের আগে আর্যরা এদেশে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

বাংলাদেশে যথার্থ আর্য-আগ্রাসনের সূত্রপাত হয় গুপ্ত শাসনামলের প্রথমার্ধে, সমুদ্রগুপ্তের(৩৪০-৩৭৬ খ্রি.) কাল থেকে। কারণ এ সময়ই প্রথমবারের মতো কোনো আর্য রাজা এদেশের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে পুর্ণ শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছিলো। তখন থেকে দেশের বিজিত

১। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭।

www.pathagar.com

অংশ বিভিন্ন প্রশাসনিক-অঞ্চলে ভাগ করে রাজ-কর্মচারীরূপী সামন্তদের হাতে শাসন ক্ষমতা দেয়া হয়। রাজার অধিপত্য কায়েম করার মতো প্রশাসনিক কাঠামোও গড়ে ওঠে। নিচ থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র নিয়োগপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীদর মাধ্যমে রাজস্ব আদায় অর্থাৎ সাধারণ মানুষদের শোষন করার প্রক্রিয়া যথাযথভাবে কাজ করতে শুরু করে। মোটকথা বাঙালিদের ওপর আর্য ধর্মীয়-সামাজিক আগ্রাসনের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে ভারতের আর্য-দখলভূক্ত অঞ্চলগুলো থেকে খাঁটি ব্রাহ্মণরা আর্য হিন্দু ধর্মের পতাকা নিয়ে দলে দলে বাংলায় এসে হানা দেয়।[১]

বাংলায় প্রবেশের পূর্বেই আর্য হিন্দু ধর্ম অমানবিক রূপ লাভ করে। নির্যাতন, আগ্রাসন ও শোষনের সমস্ত বিধিমালাই সে ধর্মে অন্তর্ভূক্ত হয়। বর্ণভেদকে ঈশ্বরের নির্দেশেরূপে গ্রহণ করা হয়। আর্য-অনার্য সংঘাতে ইন্দ্রের প্রতি আদেশ হয়, "হে ইন্দ্র! তোমার শুভ্র বর্ণের বন্ধুদিগের সহায় হও, এবং কৃষ্ণবর্ণত্বককে নি:শেষ কর।" ভারতের স্থানীয় অধিবাসীরাই ছিলো কৃষ্ণ বর্ণের। তাদেরকে নি:শেষ করার আদেশ দেয়া হয় ইন্দ্রকে। এভাবে জাতিভেদ প্রথার শুরু হয়। 'পরাজিত, অসভ্য, অসুন্দর' অনার্যদের থেকে সর্বোতভাবে নিজেদেরকে পৃথক রেখে তাদের স্থায়ীভাবে পদানত রাখাই ছিলো এই প্রথার প্রধান উদ্দেশ্য।" পরাজিত স্থানীয় লোকদেরকে দস্যু, দাস, পক্ষী, রাক্ষস ইত্যাদি নানান নামে অভিহিত করা হয়। তাদেরকে বানানো হয় ক্রীতদাস। আর্যদের বিভিন্ন গ্রন্থে এসব মানুষদেরকেই রাক্ষস, পক্ষী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। পরাজয়ের পর এরাই দাসে পরিণত হয় ঋগবেদে কোথাও কোথাও এই দাসদেরকে দ্বিপদ জন্তু হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে।'[২]

আর্য হিন্দুদের এ বর্ণভেদ প্রথা আর্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দেরকে এক দিকে আর স্থানীয় অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন উপবর্ণে ভাগ করে অন্যদিকে ঠেলে দেয়। ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধারা শক্তির উৎস বলে তাদের সাথে ব্রাহ্মণদের যোগসাজস

১। নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৩-৫৪।

২। পুলক চন্দ, *ইতিহাস সাম্প্রদায়িকতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র*, পৃ ১৭-১৮।

www.pathagar.com

ছিলো। আর সব মানুষদের সমস্তকিছুর ওপর ব্রাহ্মণদের ছিলো ঐশ্বরিক অধিকার। সে সব অবহেলিত, উপেক্ষিত মানুষেরাই সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু উৎপাদন করতো, সেবাধর্মী কাজ করতো। বলা বাহুল্য নিম্নশ্রেণীর এ মানুষগুলো নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রীর যৎসামান্যই ভোগ করতে পেতো, সিংহভাগ চলে যেতো শাসক ও ব্রাহ্মণদের সেবায়।[১]

উপরোক্ত চার শ্রেণীর বাইরে ছিলো আরো অসংখ্য মানুষের অস্তিত্ব। এরা চন্ডাল ইত্যাদি জাতের, অস্পৃশ্য। নগরে বসবাসের অধিকার এদের ছিলো না। এরা বাস করতো দূরে, বনের ধারে।[২] এদের চেহারা দেখাও ছিলো ব্রাহ্মনদের জন্যে পাপ। এদের সাথে কোনো সামাজিক সম্পর্ক ছিলো না তাদের। চন্ডাল তো দূরের কথা, শুদ্রদের সাথেও কোনো সম্পর্ক ছিলো না ব্রাহ্মণদের। 'শাস্ত্রের বিধান: কোন ব্রাহ্মণ যদি শুদ্রের খাবার পাকস্থলীতে নিয়ে মারা যায় তাহলে পরজন্মে সে হয় গ্রামের শুকর হবে না হলে সেই শুদ্রেরই ঘরে জন্ম নেবে।'[৩] হিন্দু ধর্মের এসব শাস্ত্রীয় বিধান থেকে বোঝা যায় সে সময় ব্রাহ্মণরা কি রকম বর্বর পাষন্ডে পরিণত হয়েছিলো। গুপ্ত শাসকরা বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর বাঙালিদের ওপর এসব বর্বর রীতিনীতির আর্য হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালায় ব্রাহ্মণরা।

গুপ্ত আমলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী গুপ্ত রাজাদের আশ্রয়ে আর্য ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম এবং স্থানীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী বাঙালিদেরকে জোরপূর্বক হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে শুরু করে। বাংলাদেশের বাইরে থেকে এসে এসব ব্রাহ্মণরা এদেশের মানুষের হর্তাকর্তা হয়ে বসে। এ খবর পাওয়া যায় গুপ্ত যুগেরই বিভিন্ন শিলালিপি-তাম্রলিপিতে।[৪]

শাসকগোষ্ঠীর সমর্থন ও উৎসাহে বলীয়ান হিন্দু ব্রাহ্মণরা গুপ্ত আমলের মাঝামাঝি সময়ে পঞ্চম শতকে উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ বর্তমান দিনাজপুর-রংপুর-রাজশাহী এলাকায় আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির শক্ত ভিত স্থাপন করতে সক্ষম

১। পূর্বোক্ত, পৃ ১৮-১৯।
২। দ্রষ্টব্য: চর্যাপদ।
৩। পুলক চন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯।
৪। মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৪-৪৫।

www.pathagar.com

হয়েছিলা। তবে খুব, সম্ভবত, তখনো বৌদ্ধরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো। বাংলার অন্যান্য অংশেও কিছু কিছু মানুষের ওপর হিন্দু ধর্ম চাপিয়ে দেয়া হলেও উত্তরবঙ্গ ছাড়া অন্যত্র বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রবল প্রভাব ছিলো। নির্যাতন নিপীড়ন করেও ব্রাহ্মণরা বাংলার অন্যান্য অংশের বৌদ্ধদের নির্মূল করতে পারেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পার্থক্য আরো ব্যাপক হয়। তাদের তত্ত্ব ও চর্চ্চায় বিকৃতি দেখা দেয়। এই সুযোগে হিন্দু রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্ম প্রসারে সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

গুপ্ত আমলের যত শিলালিপি পাওয়া গেছে তার প্রায় সবই হিন্দুধর্মের প্রসারকল্পে ব্রাহ্মণদেরকে নানা রকম রাজ-সাহায্য প্রদান প্রসঙ্গে খোদিত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (চতুর্থ শতক), প্রথম কুমারগুপ্ত (পঞ্চম শতক), বুধগুপ্ত (পঞ্চম শতক) প্রমুখ গুপ্ত রাজাদের বেশ কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, যে গুলো মূলত: হিন্দু ধর্ম প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণদেরকে রাজ-সাহায্য প্রদান প্রসঙ্গে খোদিত হয়েছিলো।[১] এসব শিলালিপি সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ সময় হিন্দু ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য নির্বাচিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়টিকে বাংলার বাইরে থেকে এনে বিস্তর জমি ও অর্থকড়ি দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ক্রমে এরা স্থানীয়দের ওপর নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। স্থানীয় বাঙালিদেরকে নির্যাতনের পথে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করে এদেরকে 'নিম্নশ্রেণীর হিন্দু' লেবেল লাগিয়ে দেয়া হয়। বাঙালিদেরকে ফেলা হয় বৈশ্য অথবা শুদ্র শ্রেণীতে। তার ওপর থাকে বহিরাগাত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য। ষষ্ঠ শতকের মধ্যে দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন এলাকায় বর্ণবাদী হিন্দু ধর্ম বিস্তার লাভ করতে সমর্থ হয়। এভাবে শুরু হয় বংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস। এর পর আসে শশাঙ্কের প্রসঙ্গ।

শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ এবং বৌদ্ধদেরকে নির্মূল করার জন্য তার নির্মমতার কথা আজ সুবিদিত। বিদেশী পরিব্রাজকও (হিউয়েন সাঙ) শশাঙ্কের নিষ্ঠুরতার কথা লিখে গেছেন। শশাঙ্ক যখন ক্ষমতায় আসেন তখনো বাংলায় বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিলো। রাজশাহী-বগুড়া-দিনাজপুরসহ পদ্মার উত্তর তীর এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীর কর্তৃক বেষ্টিত বর্তমান সমগ্র উত্তরবঙ্গের সবটুকুই

১। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৪-৪৫।

www.pathagar.com

শশাঙ্কের দখলে চলে গিয়েছিলো। তখন এ অঞ্চলের নাম ছিলো পুন্ড্রবর্ধন। কিন্তু শশাঙ্কের আগে ও পরে বঙ্গ, সমতট, পট্টিকেরা সহ আরো কয়েকটি রাজ্যে স্বাধীন শাসক ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।[১] এদের অনেকে বৌদ্ধ ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে বৌদ্ধ রাজাদের আধিপত্য ছিলো। এবং সামগ্রিকভাবেই বাঙলায় বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিলো।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত থাকায় সেখানে গুপ্ত আমলেই হিন্দুদের পুরো আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এক উত্তরবঙ্গ ছাড়া বাংলাদেশে ধর্মীয়ভাবে বৌদ্ধদের প্রাধান্য আর সামাজিক রাজনৈতিকভাবে স্থানীয়দের আধিপত্য চলতে থাকে।

শশাঙ্কের আমলে এ অবস্থার অবসান ঘটে। শশাঙ্ক তাঁর সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়া ধারক ও বাহক ছিলেন। ফলে তখন ব্রাহ্মণদের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পায়। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ থেকে শুরু করে যৌন নির্যাতনও চলে স্থানীয় 'নিম্নশ্রেণীর হিন্দু'দের ওপর। শশাঙ্ক যে গুরুতর বৌদ্ধ বিদ্বেষী এবং নিষ্ঠুর ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রামাই পন্ডিতের "শূন্য পুরাণ" থেকেও। সেখানে উল্লেখ আছে, "কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধদের উপর অশেষ অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহার একটি আদেশ হইতে তাহার নিষ্ঠুরতার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে:

আ-সেতোর আতুষারাদ্রের্ বৌদ্ধানং বৃদ্ধবালকান।
যো ন হন্তি সো হন্তব্য ভৃত্যান্ ইত্যশিষন্ নৃপতি ॥

(সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত যেখানে যত বৌদ্ধ আছে, তাহাদের বৃদ্ধ ও বালকদের পর্যন্ত যে না হত্যা করিবে সে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হইবে— রাজভৃত্যদিগের প্রতি রাজার এই আদেশ।)[২]

১। এদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মানুসারী গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব শক্তিমান শাসক ছিলেন।
২। শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়, রামাই পন্ডিতের শূন্য পূরাণ, পৃ ১২৪।

www.pathagar.com

নিম্নশ্রেনীর দরিদ্র নারীদের ওপর ব্রাহ্মণদের যৌন নির্যাতনেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রাচীন সাহিত্যে। অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের স্পর্শে পাপ হলেও হিন্দু ধর্মের বিধান ছিলো যে ব্রাহ্মণ ইচ্ছে করলে অন্ত্যজ মেয়েদের শয্যাসঙ্গিনী করতে পারবেন। এই ভোগে কোনো পাপ হবে না।[১]

বাংলায় এই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধরাই ছিলো আদি বাঙালি। এক সময় ভিনদেশী ব্রাহ্মণরাই বাঙালি হিন্দু সমাজ, বিশেষত দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অধিকর্তা হয়ে বসে। স্থানীয়দের সংস্কৃতি ও ভাষা ধ্বংস করার জন্যে এরা উঠে পড়ে লাগে। স্থানীয় ভাষার চর্চ্চাকে এরা পাপ বলে ঘোষনা দেয়।[২]

শশাঙ্কের পর বৌদ্ধ পালগণ ক্ষমতায় এলেও তারা হিন্দুদের উচ্ছেদের চেষ্টা চালাননি, ইতিহাসে তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, পাল আমলেও যে ব্রাহ্মণদের নির্যাতন অব্যাহত ছিলো তার সাহিত্যিক ও অন্যান্য ইঙ্গিত মেলে চর্যাপদে। পালদের সময় বৌদ্ধদের মধ্যে বিভক্তি আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে।

পালদের পর বারো শতকে আবার এক বিদেশী শাসকগোষ্ঠী—হিন্দু সেনবংশ—ক্ষমতায় এলে ব্রাহ্মণরা নতুন উৎসাহে ধর্ম বিস্তারে আত্মনিয়োগ করে। বল্লাল সেন নিজে ছিলেন গুরুতর আর্যত্ববাদী হিন্দু। হিন্দু ধর্মে চার বর্ণের প্রচলনের ফলেই স্থানীয় হিন্দুরা এক অমানবিক জীবনধারায় পতিত হয়েছিলো। বল্লাল সেন এসে নিজেই ধর্ম-শাসন শুরু করলেন। চার জাতকে তিনি ছত্রিশ জাতে বিভক্ত করলেন। শ'দুয়েক বছর পরে অবশ্য ছত্রিশের বদলে দুশো'র বেশি জাত সৃষ্টি করা হয়।

পাল ও সেন আমল জুড়ে বাঙালির ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে কিছু গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। গুপ্ত শাসনামলেই বৌদ্ধরা দলে দলে তিব্বত নেপাল প্রভৃতি দেশে পাড়ি জমায়। পাল আমলে বৌদ্ধদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেও অন্য

১। Benjamin Walker, Hindu World, Vol. 1, p-173

২। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৬-৮০।

www.pathagar.com

আঘাত আসে ভেতর থেকে। হিন্দু ধর্মের প্রভাবে (অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মণদের সক্রিয় চেষ্টায়) হিন্দুধর্মের বহু নষ্ট আচর-প্রথা বৌদ্ধ ধর্মে ঢুকে যায়। শৈথিল্য আসে বিশ্বাসে ও চর্চ্চায়। ফলে এ ধর্মের প্রতি উদাসীনতা দেখা দেয়। অন্যদিকে, হিন্দু ধর্মানুসারীদের ওপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, বর্ণভেদের অমানবিক নির্যাতন প্রভৃতির কারণে বিদ্রোহ মাথাছাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এ ক্ষোভ ও বিদ্রোহেরই প্রকাশ ঘটে নাথপন্থী, বৌদ্ধ সহজিয়া ইত্যাদি ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বৌদ্ধ ধর্ম, শিবতান্ত্রিক সম্প্রদায় এবং আরো বিভিন্ন স্থানীয় ধর্মমতের সমন্বয়ে এসব ধর্মমত গড়ে ওঠে। হিন্দু ধর্মে স্থানীয় ভাষার চর্চ্চাকে পাপ বলে ঘোষনা দিলেও এদেশের অধিবাসীরা কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতিকেই আঁকড়ে থাকে। হিন্দু ব্রাহ্মণরা এদেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য সবরকম চেষ্টাই করেছিলো। কিন্তু এসব নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকেই পরিপুষ্ট করতে থাকে। এদের ধর্মচর্চ্চা ও সাধনার সুত্রেই বাংলা ভাষা টিকে যায় এবং একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত বিকশিতও হয়। তা না হলে হয়তো এদেশের ইতিহাস অন্যভাবে সৃষ্টি হতো, যেমন চেয়েছিলো বহিরাগত ব্রাহ্মণরা।

পাল ও সেন আমলে আরেকটি সুদূরপ্রসারী গুরুতর পরিবর্তন সূচিত হয় বাংলাদেশে। তা হচ্ছে এদেশে ইসলামের প্রচার। অনেকে মনে করেন পালদেরও আগে বানিজ্য উপলক্ষে আরবদের এদেশে আসা যাওয়ার সূত্রে কোথাও কোথাও ইসলাম প্রচারিত হচ্ছিলো। ব্যবসা উপলক্ষে আরব বনিকরা এদেশে আসতো ইসলামের জন্মের অনেক আগে থেকে। এ সূত্রে দক্ষিণ ভারতের মালাবার, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে ইসলামের প্রচার চলতে থাকে সাত/আট শতক থেকে। একই সময়ে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে মুসলমান শাসকরা এগুতে থাকে। দশ-এগারো শতকে যে বাংলায় অন্তত: তিন জন ইসলাম ধর্ম-প্রচারক বেশ বড় এলাকা জুড়ে ইসলামের প্রভাব সূচিত করেছিলেন তা ঐতিহাসিক সত্য।[১] এগারো শতকে এদেশে আরো ক'জন সুফী-দরবেশের আগমন ঘটে। নির্যাতিত নিম্নবর্ণের হিন্দু ও প্রচ্ছন্ন

১। নবম শতকে বায়োজিদ বোস্তামী চট্টগ্রামে, এগারো শতকে শাহ সুলতান রুমী নেত্রকোনায় এবং সুলতান মাহমুদ বলখী মাহি সওয়ার বগুড়া ও ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেন।

www.pathagar.com

বৌদ্ধরা, স্বাভাবিকভাবেই, ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা গেলে ইসলামের প্রচারে আরো তোরজোর যুক্ত হয়। ইসলামের সাম্যবাদী মন্ত্রে উজ্জীবিত নিম্নশ্রেনীর হিন্দু এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এর ফলে বর্তমান বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। আন্দাজ করা যায়, পরবর্তী দু'শ বছরের মধ্যে ইসলাম এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। নতুন মুসলমান অর্থাৎ পূর্বের 'নিম্নশ্রেণীর হিন্দু' ও বৌদ্ধদের প্রতি আগে থেকেই ব্রাহ্মণ তথা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ঘৃণা ও অবজ্ঞা দেখাতো, সেই সাথে ছিলো ধর্মের নামে অত্যাচার। পরবর্তীতে অত্যাচারিত শ্রেণীটি শাসকের ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে একদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নশ্রণীর লোকদের উপর নির্যাতন ও আদেশের অধিকার হারায়, তেমনি নতুন মুসলমানরা ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শেষবিন্দু প্রভাবটুকু মানতেও অস্বীকার করে। নতুন মুসলমানরা সবদিক থেকেই হয়ে ওঠে স্বাধীন। আর ক্ষমতা হারিয়ে, স্বাভাবিকভাবেই, আশরাফ হিন্দুরা ক্ষোভ ও ঈর্ষা লালন করতে থাকে। তারা বঞ্চিত হয় দু'দিক থেকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেয় বহিরাগত মুসলমানরা। অন্যদিকে, ধর্মের নামে যেটুকু শোষন ও প্রতিপত্তি খাটোনো যেতো তাও নষ্ট হয় মুসলমানদের কারণে। ফলে তখন থেকেই তাদের মনে মুসলমানদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও প্রতিশোধ-স্পৃহা জন্ম নেয়। হিন্দু ব্রাহ্মণরা নানা বিধি নিষেধ আরোপ করে মুসলমানদেরকে ম্লেচ্ছ ও অচ্ছুৎ ঘোষিত করে। সাধারণ হিন্দুদের মনে এমন ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে মুসলমানদের ছায়াও কোনোক্রমে হিন্দুর গায়ে লাগলে সে হিন্দুর জাত যাবে। এসব কারণে মুসলমানদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

মধ্য যুগের হিন্দু মুসলমান বিভেদের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো হিন্দু মুসলমান সংঘাতটা শুরু হয়েছিলো মুসলমান বনাম উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ঘিরে। মুসলমানরা ক্ষমতায় আসার পর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ক্ষোভটা আরো ব্যাপক পটভূমি পায়। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয়—এই দ্বিবিধ জিগাংসা জন্ম নেয়। এর পাশাপাশি নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র সমাজে সম্পূর্ণ ভিন্ন

www.pathagar.com

অবস্থা বিরাজ করছিলো। সে বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা দরকার।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, বহিরাগত ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্নের আর্য-হিন্দুদের শিকার হয়েছিলো প্রধানত: স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসীগণ। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে এদের অনেকেই হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও রাজাদের নিপীড়ন হিন্দু ও বৌদ্ধ—এ দুপক্ষের ওপরই চলতে থাকে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্যাতনের স্বীকার হয় বাঙালিরা—হিন্দু বা বৌদ্ধ যাই হোক না কেন। এর ফলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙালিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও আর্য রাজশক্তির প্রতি সাধারণ (common) ঘৃণা ও ক্ষোভ জেগে উঠে। অত্যাচারিত বাঙালিরা ছিলো একই সাংস্কৃতিক ও ভাষিক পৃথিবীর বাসিন্দা। হিন্দু ধর্মের ভেদ-বুদ্ধি তাদের সামাজিক সম্পর্ককে কুলুষিত করতে পারেনি। তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করার পরও নিজ শ্রেনীর হিন্দু ও বৌদ্ধদের সাথে (যারা সংখ্যায় একেবারেই কমে গিয়েছিলো) তাদের সুসম্পর্ক নষ্ট করেনি। ধর্মকে ঘিরে কখনো কখনো হয়তো গোলযোগ বেঁধেছে, তবে সন্দেহ নেই তা বাঙালি সমাজে কোনো মারাত্মক ফাটল ধরাতে পারেনি। মুসলমান রাজশক্তি ক্ষমতায় আসার পর ব্রাহ্মণরা স্থানীয় হিন্দুদেরকেও কিছুটা ছুৎমার্গী করে তুলতে পেরেছিলো। তবে মুসলমানরা হয়তো এ অস্বাভাবিকত্বটুকু মেনে নিয়েই সামাজিক সদ্ভাব বজায় রেখেছে। তার উল্লেখ পাওয়া যায় সমকালীন সাহিত্যে। মধ্যযুগের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্কের বর্ণনা আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগে বাঙালি জাতি ধর্মের ভেদ স্বীকার করে পারস্পরিক আত্মহননে লিপ্ত হয়নি।

মধ্যযুগের বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম শাসক সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে তারা সাম্প্রদায়িক ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে। বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকে আরম্ভ করে সিরাজউদ্দদৌলা পর্যন্ত প্রায় সবাই ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিলেন। তাদের আমলে কোনো কোনো রাজকর্মচারী হিন্দু প্রজাদের ওপর বাড়তি নির্যাতন চালিয়েছে বলে এখানে সেখানে কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। সারা দেশের তুলনায় তাদের সংখ্যা একেবারেই নগন্য। যেখানে এধরনের উল্লেখ পাওয়া গেছে

www.pathagar.com

সেখানে এ তথ্যও মিলে যে প্রকৃত ঘটনা সুলতানদের কানে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট রাজকর্মচারীকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এধরনের ঘটনার সাথে অনেক হিন্দু কর্মচারীও যুক্ত ছিলো। এর থেকে আন্দাজ করা যায় মুসলমান আমলে হিন্দুদের ওপর ধর্মীয় বিদ্বেষ-প্রসূত কোনো নির্যাতন হয়নি। যে শোষন-নির্যাতন চলেছে তা শোষিতের ওপর শাসকের জুলুম মাত্র, সর্বহারা শ্রেণীর ওপর ক্ষমতাবানদের অত্যাচার। এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। যারা এ সত্যটিকে বিকৃত করে মধ্যযুগের প্রজা নির্যাতনের বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক অত্যাচার হিসেবে চালিয়ে দিতে চান, তাদের উদ্দেশ্য অসৎ।

মধ্যযুগের ভারতীয় উপমহাদেশে যে সব মুসলমান শাসক ক্ষমতায় এসেছেন তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমানদের মসজিদ ভেঙ্গেছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের কেউ কেউ খাঁটি মুসলমান ছিলেন। আওরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমানই ছিলেন। কিন্তু ধর্ম নিয়ে তিনিও বাড়াবাড়ি করেননি। আমরা এখানে মুসলমান শাসকদের ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতির সত্যতা সম্পর্কে পুলক চন্দের "ইতিহাস সাম্প্রদায়িকতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র" গ্রন্থে প্রাপ্ত কিছু ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরতে পারি।

পুলক চন্দ লিখেছেন:

স্বভাবতই, বিজয়ী আরব যোদ্ধা মহম্মদ বিন কাশিম ৭১২তে সিন্ধু প্রদেশ আক্রমন করে যখন সেখানে মন্দির ভেঙ্গেছিলেন, মসজিদ বানিয়েছিলেন— তখন তাঁকে জানানো হয়েছিলো যে, কাজটি ঠিক 'আইন সম্মত' হয়নি। শধু তাই নয় তার উপর 'বিজিত দেশের যা যা নষ্ট হয়েছে তা পুরণ করে দেবার' নির্দেশ এসেছিলো। উপদেশ পেয়েছিলেন বিন কাশিম, 'তাঁরা যখন আত্মসমর্পণ করেছে এবং খলিফাকে কর দিতে সম্মত হয়েছে তখন বস্তুত আর কিছুই তাদের কাছে দাবী করা চলে না। তারা আমদের আশ্রিত, আমরা তাঁদের জীবন ও সম্পত্তিতে হাত দিতে পারি না। তাদের স্বাধীন পূজা-আর্চার অধিকার দেয়া হলো।'

www.pathagar.com

----------ধর্মবোধই যদি মন্দির ভাঙ্গার একমাত্র কারণ হবে তাহলে সিকান্দার লোদি (১৪৮৯-১৫১৭)-ই বা কেন জৈনপুরের সমস্ত মসজিদ ভাঙ্গার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, যেখানে জৈনপুরের শাসকও ছিলেন তাঁরই মত মুসলমান! অন্যদিকে, কাশ্মীরের দ্বিতীয় লহরী রাজবংশের রাজা হর্ষই (১০৮৯-১১০১) বা কেন একাধিক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করবেন রাজকোষকে অর্থসমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যই যদি না থাকবে ? আরো মজার বিষয়, এই হর্ষ (কল্‌হনের "রাজতরঙ্গিণী" থেকে জানা যায়) নিয়মিত মন্দির লুট করবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন একজন বিশেষ (হিন্দু) রাজকর্মচারীর ওপর যার উপাধিই ছিলো 'দেবোৎপাটননায়ক'—অর্থাৎ দেবতাকে উৎপাটন করা যার কাজ।"[১]

পুলক চন্দ এও উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দু আইন আনুসারে শাসন কার্য পরিচালনার জন্য কতুব উদ্দিন আইবককে পরামর্শ দিতো জনৈক ব্রাহ্মণ। আর সব ধরনের অনুষ্ঠানে সাহায্য করতো ব্রাহ্মণ গ্রহাচার্যেরা। আলাউদ্দিন খলজী কোনো ইসলামী অনুশাসন মানতেন না। হুমায়ূনের প্রতি বাবরের শেষ উপদেশ ছিলো: *কখনো ধর্মীয় সংস্কার যেন তোমার মনকে প্রভাবিত না করে। সমস্ত সম্প্রদায়ের দেশবাসীর ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা ও ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতি প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধার ভাব রেখে নিরপেক্ষ বিচার করবে।*[২] আকবর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক হিন্দু মন্দিরে আবুল ফজল লিখে রেখেছেন:—কপট উদ্দেশ্যে যে চাইবে এই মন্দির ভাঙ্গতে সে আগে যেন নিজের উপাসনালয় ধ্বংস করে।"[৩]

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের প্রায় সবার দরবারে উচ্চপদে আসীন ছিলেন হিন্দু রাজকর্মচারী। রুকনুদ্দীন বারবক শাহর পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু ও কৃত্তিবাস সাহিত্য চর্চা করে গেছেন। কৃত্তিবাস তো রামায়নের অনুবাদে ব্যাপৃত ছিলেন। রুকনুদ্দীন নিজে পরম ধর্ম-নিরপেক্ষ না হলে কি করে তা সম্ভব হলো ? আকবরকে হিন্দু প্রজারাই অবতারের আসনে বসিয়েছিলো। জাহাঙ্গীরের সময় অন্তত তিনটি অঞ্চলের রাজ্যপাল ছিলেন অমুসলমান

১। পুলক চন্দ, ইতিহাস ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সাম্প্রদায়িকতা, পৃ ৩১-৩৩।

২। পুলক চন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬-৩৭।

৩। পুলক চন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৮।

www.pathagar.com

অভিজাত হিন্দু। আওরঙ্গজেব হিন্দু, শৈব ও জৈন মন্দিরের জন্য অনেক নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। ঢাকার ধামরাইয়ে যেখানে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় সে স্থানের জগন্নাথ মন্দিরটি আওরঙ্গজেবের নির্দেশে নির্মিত হয়েছিলো। মন্দিরগাত্রের পাথরে সে তথ্য উৎকীর্ণ আছে। আওরঙ্গজেব তাঁর হিন্দু প্রজাদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর কর্মচারীদের অনেককে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। মুসলমান শাসকরা যে সাম্প্রদায়িক বা হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না তা বোঝার জন্য পুলক চন্দের গ্রন্থটিতে উল্লেখিত উপরের তথ্যগুলোই যথেষ্ট মনে হয়।

এ সময় পরিসরে আরো কিছু পরিবর্তন ঘটে বাঙালি সমাজে। বহিরাগত ব্রাহ্মণরা শত শত বছর এদেশে বাস করে নানা দিক থেকে আর্য সংস্কৃতি বজায় রেখে তার প্রসারের চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয় বাঙালি সংস্কৃতির সংস্পর্শে। আর্য সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি প্রচন্ড শ্রদ্ধা ও টান সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এদের মধ্যে জায়গা করে নেয়। এভাবে এদের হাতেই সৃষ্ট হয় এক মিশ্র সংস্কৃতি। মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ্বে এসে এরা বাঙালি সমাজেরই অংশ হয়ে ওঠে। কিন্তু এদের মন থেকে মুসলমানদের প্রতি ক্ষোভ দূর হয়নি কখনো। বরং এরা ক্রমান্বয়ে চেষ্টা চালিয়ে গেছে নিম্নশ্রেনীর হিন্দুদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য।

এই সময় বৈশ্যদের মধ্যেও ব্যাপক বদল আসে। শাসন ক্ষমতায় মুসলমানরা অধিষ্ঠিত থাকায় এবং বৈশ্যরা বিত্তের মালিক হওয়ায় ব্রাহ্মণরা এদের ওপর খুব একটা নির্যাতন চালাতে পারতো না। অবশ্য তখনো ব্রাহ্মণরা এদেরকে অস্পৃশ্য করেই রেখেছিলো। সারা মধ্যযুগ জুড়ে এই বৈশ্যরাই বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। অর্থের মালিক হয়ে সমাজে তাদের কিছু প্রতিপত্তি আসে। বিশেষ করে নগর এলাকায় তারা বণিক-সমাজ ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতা কেন্দ্রের কাছাকাছি বিচরণ করার সুযোগ পায়। সাধারণ দরিদ্র জনগণের মানবেতর জীবন-ধারা থেকে এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে ব্রাহ্মণ্য নির্যাতন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ধনী বৈশ্যদের মধ্যে আর নির্যাতিত শ্রেণীর সাধারণ

www.pathagar.com

সহমর্মিতা বোধ কাজ করতো না। অর্থের মালিক হয়ে এরা বরং ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠে। এবং স্বভাবতই অর্থ ও ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে এদের মধ্যে মুসলমান রাজকর্মচারী ও রাজকীয় ব্যাক্তিত্বের প্রতি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব জন্ম নেয়। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থেকেই এরা মুসলমানদের প্রতি ক্ষোভ ও রাগ পোষণ করতো। তাদের মনে মুসলিম বিরোধিতার যে বীজ গজিয়ে ওঠে তার সাথে প্রথম দিকে ধর্মের যোগ ছিলো সামান্যই। তবে ব্রাহ্মণরা এ সুযোগটি কাজে লাগায়। তারা অর্থ ও প্রতিপত্তিপ্রাপ্ত বৈশ্যদের মনেও মুসলিম-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়। তার আকস্মিক ও তীব্র প্রকাশঘটে ১৭৫৭ সালে। এবং বিস্ময়কর ব্যাপার যে তখনো নিম্নশ্রেণীর বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক খুব একটা তিক্ত হয় নি, যত দিন না উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সমাজের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

১৭৫৭ সালে ক্ষমতাবান বাঙালিদের অন্তর্কলহের কারণেই ইংরেজরা বাংলার স্বাধীনতা হরণ করে নিতে পেরেছিলো । এই অন্তর্কলহ ছিলো শাসকগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব—শাসক মুসলমানদের সাথে উচ্চশ্রেণীর বিত্তবান হিন্দুর দ্বন্দ্ব। একই কারণে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো গণপ্রতিরোধও দেখা দেয়নি। শাসন ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়ে বনেদী মুসলমানরা ঘরমুখী হয়ে যায়। হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি যে ঘৃণা পোষণ করে এসেছে এতোদিন, একই ঘৃণা জন্ম নেয় মুসলমানের মনে। ইংরেজদের সমস্ত কর্মকান্ড থেকে দূরে সরে থাকে তারা। সম্পদশালী মুসলমানরা তাদের জমি, বিষয়-আশয় দেখাশোনার ভার হিন্দু কর্মচারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এক ধরণের গ্লানির মধ্যে আত্মসমর্পণ করে। এ সুযোগে তাদের হিন্দু কর্মচারীরা অচিরেই প্রভূত অর্থের মালিক হয়ে ওঠে।

এ সময় গ্রামাঞ্চল থেকেও কিছু কিছু লোক আসতে থাকে নবগঠিত নগর এলাকা কলকাতায়, ভাগ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। ইংরেজরা এদের মধ্য থেকে তাবেদার বাঙালি বেনিয়ান, মুনসী, দালাল, মুৎসুদ্দী শ্রেনীটি গড়ে তোলে। এ নতুন সৃষ্ট শ্রেণীটিই সাধারণ মানুষকে শোষন করে নেয়া অর্থ ইংরেজ ও নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে থাকে।

www.pathagar.com

ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনেই উৎপাদন ও বানিজ্য ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ভারতের তাবৎ পণ্যের ব্যাবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাবেদার হিন্দুদের মধ্য থেকে মধ্যসত্বভোগী মহাজন, দালাল, ফরিয়া ইত্যাদি সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, ইংরেজরা বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেয়ারও চেষ্টা চালায়। এতে উচ্চশ্রেীর হিন্দুদের মুসলিম-বিদ্বেষে বারুদ যোগানোর কাজটা সম্পন্ন হয়। হিন্দুরা হয়ে উঠে প্রতিশোধ-প্রবণ। এ সময় পরিসরে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের একাংশও কিছু অর্থবিত্তের মালিক হয়। যথারীতি এদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা সঞ্চার করে দেয়া হয় কৌশলে। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় মুসলমানদের মধ্যে। তারাও হয়ে ওঠে হিন্দু বিদ্বেষী।

জমিদারী প্রথা শুরু হলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ জমিদারী হিন্দুদের হাতে চলে গেছে। কারণ তাদের হাতে অর্থ ছিলো। অন্যদিকে মুসলমানরা তখনো বৃটিশ রাজ্যব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। এ সুযোগে এক শ্রেণীর নব্য ধনী হিন্দু বিভিন্ন স্থানে জমিদারী কিনে শোষন ও অত্যাচারের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। এই জমিদার শ্রেণীটি দীর্ঘদিন ইংরেজদের অর্থ যোগানের অস্ত্র হিসেবে বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করে। কোলকাতাকেন্দ্রিক এসব হিন্দুদের বেশিরভাগেরই জমিদারী ছিলো পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে। এই জমিদার শ্রেণীর হিন্দুদের এবং তাদের হিন্দু কর্মচারীদের আচার আচরণে, কাজকর্মে মুসলমানদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেতে থাকে। মুসলমান প্রজাদের ওপর এদের অত্যাচারের মাত্রাটাও দিন দিন বাড়ছিলো। ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু জমিদার ও কর্মচারীদের প্রতি ক্ষোভ জমতে থাকে।

এরই সমান্তরালে দেখা দেয় আরেকটি গুরুতর পরিবর্তন। ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনে যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেছিলো শুরুতে, তাতে ক্রমশ বেশি মানুষ আকৃষ্ট হতে থাকে। কারণ ইংরেজী শিক্ষার সাথে সহজে চাকুরী, ক্ষমতা ও অর্থ উপার্জনের একটা গভীর যোগ ছিলো। ফলে ইতিপূর্বে ঝিমিয়ে যাওয়া ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের একটা অংশ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় । ইংরেজদের পূর্ণ প্রশাসন কায়েম হলে এদের মধ্য থেকে প্রশাসনের মাঝারি গ্রুপটি বেছে নেয়া হয়। এদের মধ্য থেকেই,

www.pathagar.com

ইংরেজের অনুকরণে, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড—পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, সংঘ-সভা গঠন, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, সাহিত্য চর্চ্চা প্রভৃতির বড় স্রোতটি পরিচালিত হতে থাকে। এদের মস্তিষ্কেই ভারতীয় পুনরুজ্জীবনের মন্ত্র প্রথম আবৃত্ত হয় ইউরোপীয় রেনেসাঁর অনুকরণে। সেই পুনরুজ্জীবনের প্রেরণা এসেছিলো বাইরে থেকে, ইংরেজী শিক্ষার হাত ধরে।[১] সেই আলোড়ন ইয়ংবেঙল, ব্রাহ্ম্যমত ইত্যাদি নানা ঘাট ঘুরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ্বে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদে এসে স্থিত হয়।

উনিশ শতকের হিন্দু বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের নামে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধবাদিতার মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী সাম্পদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেয়ার কাজটি সম্পন্ন হয় । উনিশ শতকের প্রথম থেকে হিন্দু বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতীয় পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ্বে এসে তাদের সে আন্দোলন পরিপূর্ণ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়। গুপ্ত-শশাঙ্ক-সেন আমলে যে হিন্দুরা বাংলা ভাষার চর্চ্চাকে পাপ বলে ঘোষনা দিয়েছিলেন, তাদেরই বংশধররা এবার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও শুদ্ধিকরণে উঠে পড়ে লাগেন। এ শুদ্ধিকরণ ছিলো বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে মুসলমানদের প্রভাব এবং আদি বাঙালি জাতির ছাপ সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা।

ইতোমধ্যে নানান রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রায় তিন হাজার আরবী ফারসী শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছিলো। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীরা বাংলা ভাষার 'উন্নতিকল্পে' এসব আরবী-ফারসী শব্দ উচ্ছেদ করে এগুলোর বদলে খাঁটি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত করেন।[২] একইভাবে, সংস্কৃত থেকে বাংলায় রূপান্তরিত (অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব) বহু শব্দের স্থানে খাঁটি সংস্কৃত শব্দের প্রচলন করা হয়। এ সময়ের প্যারিচাঁদ মিত্রের রচনা এবং বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের লেখার তুলনা করলে বাংলা ও 'সংস্কৃতায়িত বাংলার' পার্থক্যটা বোঝা যাবে।

১। নীহার রঞ্জন রায়, *ইতিহাস চর্চ্চা*, পৃ ১০।

২। Benjamin Walker, Hindu World, Vol. 1, p-130।

www.pathagar.com

এদিকে বনেদী মুসলমানরা বাংলা ভাষার ওপর হিন্দুদের সংস্কারের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইসলামী সংস্কৃতি ও 'ইসলামী ভাষার' চর্চ্চা শুরু করেন, এবং ঈর্ষাজনিত কারনেই ইংরেজী শিক্ষা থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালান। নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের এই প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্তের জন্য গোটা মুসলিম সমাজ, হিন্দুদের তুলনায়, কয়েক দশক ধরে পিছিয়ে থাকে। সাধারণ মুসলমানরা নানা দিক থেকে বঞ্চিত হয়। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চ্চা চলে স্বতস্ফূর্তভাবেই। কিন্তু মৌলবাদী হিন্দুদের প্রচেষ্টায় লেখ্য বাংলা এবং বাঙালির সংস্কৃতিতে ব্যাপক বদল ঘটে যায়।

মধ্যযুগেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতির কারণে এবার তারা সফল হয়। সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশে হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক ঘৃণা ও ক্ষোভ জায়গা করে নেয়।

উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে মুসলমানদের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত কিছু কিছু মুসলমান ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয় এবং প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করতে পারে যে, তারা প্রচলিত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক ধারার তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। এদের চেষ্টার ফলে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষায়, সমাজকর্মে, রাজনীতিতে—সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে থাকে। এর মধ্যে, প্রধানত জমিদার-ব্যবসায়ী-বুদ্ধিজীবি পেশাজীবির আবাসস্থল পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থবিত্তে অনেক এগিয়ে যায়। বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রজাদের ঘামে শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য পশ্চিমবঙ্গকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। আর, প্রধানত উৎপাদক শ্রেণীর আবাসস্থল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি অনড় থেকে যায়। কোলকাতায় গড়ে উঠতে থাকে কলকারখানা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পোত্তর যুগের সমস্ত সুবিধাদি। আর ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশ পড়ে থাকে প্রায় পূর্বের অবস্থাতেই।

এ পরিস্থিতিতে মুসলমানরা, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানানোর উদ্যোগ নেয়। সে

www.pathagar.com

সুযোগটিই গ্রহণ করে ইংরেজরা, মুসলমানদের আবেগের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেয়; বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯০৫ সালে বাংলাকে দুই ভাগ করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশ ও আসামকে নিয়ে একটি প্রদেশ গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিহার নিয়ে গঠিত হয় অন্য একটি প্রদেশ। এ বাংলার রাজধানী হয় ঢাকা। ঢাকাতেও কোলকাতার মতো দালান কোঠা তৈরি শুরু হয়। কোলকাতার তাবেদার হিন্দু গোষ্ঠীটির মতো এখানেও জন্ম নেয় মুসলমান তাবেদারদের একটি দল। ঢাকায় ইংরেজরা এ মুসলমান তাবেদার গোষ্ঠীটিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করে, যেমন করেছিলো কোলকাতায়, একশ' বছর ধরে।

বঙ্গভঙ্গের কারণ হিসেবে মুখে বাংলাদেশের উন্নতির কথা বললেও আসলে বঙ্গভঙ্গের পেছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিলো দু'টি: এক—বিদ্রোহীভাবাপন্ন বৃহৎ অঞ্চলটিকে ছোটো দু'টি প্রদেশে ভাগ করে প্রশাসনিক সুবিধা লাভ করা, দুই—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আরো ভেদ সৃষ্টি করে তাদের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করা।

বঙ্গভঙ্গে মুসলমানদের পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার সম্ভবনা ছিলো। এ কারণে মুসলমান জমিদার ও কিছু উচ্চ-শ্রেণীর মুসলমান নাগরিকও বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করেন। কিন্তু হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীরা সাথে সাথে এর প্রতিবাদ জানান। কারণ বঙ্গভঙ্গ হলে পূর্ব-বাংলায় তাদের প্রতিষ্ঠিত জমিদারী হারাতে হবে, কোলকাতায় বসে পূর্ব-বাংলার কাঁচা মালের ব্যবসার মজা লুটা বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের সাথে উদারপন্থী মুসলমানরাও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে যোগ দেয়। উল্লেখ্য যে, এসব মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিলো বাঙালি জাতিকে এক রাখা এবং স্বাধীনতার জন্য অতি প্রয়োজনীয় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় রাখা। যাই হোক, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলনের চাপে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। যে সব হিন্দু বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাদের অনেকেরই পূর্ব-বাংলায় কোনো না কোনো বৈষয়িক স্বার্থ ছিলো।

হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ থেকেই ১৯০৬ সালে জন্ম হয় মুসলিম লীগের। এ যাবৎ কংগ্রেসে বিশ্বস্ত বহু মুসলমান কর্মী মুসলিম লীগে যোগ দেয়। ১৯১২ সালের

www.pathagar.com

পর থেকে এ সংগঠনটি রাজনীতির ক্ষেত্রে একশ ভাগ তৎপর হয়ে ওঠে। পরবর্তী দশকগুলোতে মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্লাটফরম হিসেবে কাজ করে, যদিও দেশবিভাগ পর্যন্তও বহু নেতৃত্বস্থানীয় মুসলমান কংগেসের রাজনীতিতে বিশ্বস্ত থাকেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কোন্দলের ফলে ১৯৪০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী ওঠে।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ে যখন ইংরেজদের সাথে আলোচনা চলছিলো তখনো হিন্দুরা প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্রের বিরোধিতা অব্যাহত রাখে। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে মাউন্টব্যাটন কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদে স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাকে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিলে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক আত্মীয়তার কথা মনে রেখে বাঙালি মুসলমানরা আবুল হাসেম, হোসেন শহীদ সোহরোওয়ার্দী প্রমুখের নেতৃত্বে বাঙালিদের জন্য অখন্ড ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী তোলে। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী শ্যামাপ্রসাদ অখন্ড বাংলার দাবীর তীব্র সমালোচনা করে বিবৃতি দেন এবং এর বিরুদ্ধে সমর্থন সংগঠিত করেন। কংগ্রেসের প্রগতিবাদী গ্রুপ শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে অখন্ড বাংলা আন্দোলনে সমর্থন জানালেও কংগ্রেসের মূল নেতৃত্বসহ বাঙালি হিন্দুদের প্রায় সবাই এর বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেন।

কোলকাতায় হিন্দু-প্রভাবাধীন অধিকাংশ পত্রপত্রিকাও বাংলা বিভাগের দাবীকেই সমর্থন জানিয়েছিলো। এদের সমর্থনে, অবাঙালি নেতাদের ইচ্ছায় বাংলা দু'ভাগ হয়ে যায়। এভাবে, যারা আন্দোলন করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ করে দিয়েছিলেন ব্যাক্তিগত স্বার্থের কারণে, তারাই ১৯৪৭ সালে আন্দোলন করে বাংলাকে পাকাপাকিভাবে দু'টুকরো করে ফেললেন। দু'বাংলার সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় ইতিহাসের এ সত্যের কথা ভুললে চলবে না। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সে এক দু:সময়। দু'বাংলা এক করার সুযোগ পাওয়া সত্বেও আমরা বিচ্ছিন্নতাই ডেকে এনেছি। সেই পতনের ইতিহাস আমাদের মনে রাখা উচিত। তা না হলে দ্বিতীয়বার ভুল করার সম্ভাবনা থেকে যায়; দু'পক্ষের কারোরই তা কাম্য নয় সম্ভবত।

www.pathagar.com

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা

আর্যদের আগমনের পর থেকেই ধর্ম এ উপমহাদেশের রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর আর্যদের অত্যাচার, তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এ অঞ্চলে স্থায়ী অশান্তির বীজ বুনে দেয়। পরবর্তী ধাপে ব্রাহ্মণরা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ শুরু করে। যে সব বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মান্তরিত হতে চায়নি তাদের ওপর নেমে আসে অমানবিক অত্যাচার। বহু স্থানে বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করে গড়ে তোলা হয় হিন্দু মন্দির। এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু বৌদ্ধ বিহারের চিহ্ন এবং তার উপর নির্মিত হিন্দু মন্দিরের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে।[১]

বিধর্মীদেরকে যে ভাবে অত্যাচার করেছে ব্রাহ্মণরা তার চেয়ে বেশি নির্যাতন চালিয়েছে সমাজের দুর্বল-দরিদ্র, স্থানীয় হিন্দুদের ওপর। তাদেরকে প্রথমেই হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা হয় নির্যাতনের মুখে। পরে শোষনের স্থায়ী যাঁতাকলে ফেলে তাদের সর্বস্ব হরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণরা শোষণের মুখ্য অস্ত্র— জাত বিভাগ চাপিয়ে দেয় দরিদ্র হিন্দুদের ওপর। ধর্ম গ্রন্থের ভিতরে ভিতরে ইচ্ছামতো পরিবর্তন এনে, কখনো বা ধর্ম গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করে সেখানে ঈশ্বরের নামে ঘোষনা করা হয় ব্রাহ্মণরা শ্রেষ্ঠ মানুষ; আর সমস্ত মানুষের শ্রম, সম্পদ ও পরিবারের ওপর ব্রাহ্মণদের অধিকার প্রশ্নাতীত।[২]

১। পাহাড় পুর ও মহাস্থানগড়ে হিন্দু মন্দিরের নীচে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহারের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

২। Benjamin Walker, *Hindu World, Vol 1*, p- 168 ।

www.pathagar.com

প্রথম কয়েকশ' বছর চলে যায় ব্রাহ্মণ্য লৌহ শৃঙ্খলে। এর মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু (অর্থাৎ ধর্মান্তরিত স্থানীয় অধিবাসীরা) এবং বর্ণচোরা বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও অত্যাচারিতদের মধ্যে মিল ছিলো ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধিতা প্রভৃতি মৌল বিষয়ের দিক থেকে। কারণ এদের সবাই ছিলো এদেশের নাগরিক। কিন্তু এদের শ্রেণীগত সাদৃশ্য মধ্যযুগে এসে কখনো কখনো এক বিন্দুতে দাঁড়ালেও সংগ্রামী ঐক্য তৈরি হয়নি। সেই অর্থে এদের ঐক্যটা ছিলো নিষ্ক্রিয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা ক্রোধ ও ঘৃণা এদের মধ্যে কেবল বাড়তেই থাকে।

মধ্যযুগের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মমতের আবির্ভাব এবং তাতে ব্যাপকহারে নানা ধর্ম-গোত্র-মতবাদের মানুষের যোগদানের পেছনে একটা কারণ হলো ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সাধারন(comon) ঘৃণা ও ক্ষোভ। তাদের এই সাধারণ ক্ষোভের উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটে ইসলামের আগমনে। নির্যাতিতদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়নি তারাও ইসলামের প্রসারে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি, শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাদেরও ভয়াবহ ক্ষোভ ছিলো। এ কারণেই ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বখতিয়ার খিলজী অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাংলার রাজধানী দখল করে নিতে পেরেছিলেন।

রাজপদে মুসলমানদের অধিষ্ঠান ইসলাম প্রচারে দ্রুততা নিয়ে আসে। ইসলামে ধর্মান্তরিতদের প্রতি ব্রাহ্মণদের ক্ষোভ, স্বভাবতই, আরো বেড়ে যায়; বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা একটি স্থায়ী ও অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক উপাদানে পরিণত হয় । এভাবে ব্রাহ্মণ্যদের অত্যাচারের মধ্য দিয়ে সাম্পদায়িকতার যে বীজ রোপিত হয়েছিলো প্রাচীন যুগে তা বিষের মতো সমাজের উঁচু তলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণরা সে বিষ সাধারণের মধ্যেও সঞ্চারিত করার চেষ্টা চালায়। ফলে সমাজের আভ্যন্তরীণ সংসক্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

বিস্ময়কর যে আর্য-বাঙালি(বা স্থানীয়) বিরোধ যুগে যুগে তার রূপ বদলেছে বটে, কিন্তু নির্যাতিত শ্রেণীটির মধ্যে এক ধরণের সুসম্পর্ক বজায় ছিলো—ধর্মীয় দিক থেকে তারা বিভিন্ন মতের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও।

www.pathagar.com

মুসলমান এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সুসম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে।

মুসলমানরা ক্ষমতায় বসার পর সমাজে ব্যাপক বদল আসে। আগের শ্রেণীবিভাজন নষ্ট হয়ে যায়। বর্ণ-গোত্রের বদলে যোগ্যতার ভিত্তিতে সমাজে ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনদের নতুন বিভাজন দেখা দেয়। বৃটিশরা আসার পর সমাজের পুরো কাঠামোটাই আবার বদলে যায়। নিজেদের প্রয়োজনে বৃটিশরা নতুন একটি শ্রেণী তৈরি করে—প্রধানত, নৈতিক-চরিত্রহীন, ধূর্ত এবং তাবেদার মনোভাবাপন্ন হিন্দুদের নিয়ে।

অষ্টাদশ শতকে গ্রামাঞ্চল থেকে কিছু কিছু হিন্দু ভাগ্য অন্বেষনে কলকাতায় এসে ইংরেজদের শোষণের মাধ্যম অর্থাৎ দালাল, মহাজন, গোমস্তা, বণিক ইত্যাদির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। এরা ইংরেজদের তাবেদারী করে প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়।[১] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হলে বিত্তবান এই হিন্দুরাই অধিকাংশ জমিদারী কিনে নেয়।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বিশেষত ব্রাহ্মণ সন্তানগণও দেশ শাসন, রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কাজে ইংরেজদের সহযোগিতা শুরু করে। এদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে মাঝারি ও নিম্নশ্রেণীর আমলাগোষ্ঠী। উপরোক্ত দ্বিবিধ স্রোতের তাবেদারদের নিয়েই বৃটিশ ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোড়া পত্তন হয়। এরপর ইংরেজী শিক্ষার বদৌলতে চিন্তা চেতনায় রূপান্তর আসে, হিন্দু পুনর্জাগরণের নামে উগ্র হিন্দুবাদের জন্ম হয় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পন্ডিত ও জ্ঞানী হিন্দুদের হাতেই।

অন্যদিকে, হিন্দুবাদের প্রতিক্রিয়ায় এবং বৃটিশদের উস্কানিতে রক্ষণশীল মুসলমানরাও পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদেরকে রক্ষনশীল এবং হিন্দু-বিরোধী করে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। তারা কিছুটা সফলও হয়। হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষের জবাবে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানরা হিন্দু-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মুসলমানদের

১। দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষ: *মেট্রোপলিটান মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ।*

www.pathagar.com

প্রতি যে ঘৃনা ছিলো হিন্দুদের মনে, একই ঘৃণা জাগিয়ে তোলা হয় বিত্তবান মুসলমানদের মধ্যেও। ফলে উনিশ শতকে আর্য-বাঙালি বিরোধের আরেকটি রূপান্তর সম্পন্ন হয়। উপমহাদেশের স্বাধীনতা বিলম্বিত ও উন্নতি ব্যাহত হওয়ার পেছন এ কারণটিই প্রধান ভূমিকা পালন করে।

সভ্যতার ভাণ ও ভন্ডামির যুগে প্রায় সবাই নিজেকে অসাম্প্রদায়িক বলে দাবী করলেও বাস্তব পরিস্থিতিতে ধর্ম তাদেরকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। তার প্রমাণ বাংলা বিভাগ। ধর্মের ভূত এখনো আমাদের ঘাড়ে চেপে থেকে বাঙালিকে আলাদা করে দুই মেরুতে নির্বাসন দিয়ে রেখেছে।

এ জরুরী প্রসঙ্গটি পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য আমি এতোক্ষণ সাম্প্রদায়িকতার জটিল ইতিহাসের ওপর একেবারেই সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করলাম। এখানে কয়েকটি উপশিরোনামে বর্তমান অবস্থাটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়

বঙ্গ-বিভাগ হয়েছিলো সাম্প্রদায়িক কারণে। এর আগেও সাম্প্রদায়িকতা এদেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আর, সাম্প্রদায়িকতা যে সংখ্যাল্প আর্য ব্রাহ্মণের সৃষ্ট—স্থানীয়দেরকে শোষন করার হাতিয়ার তা আগেই আলোচনা করেছি। অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে দু'পক্ষের ভাগেই কম বেশি দোষ চাপে। কিন্তু গত কয়েক দশকে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা এক ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে। দেশটিতে হিন্দু মৌলবাদীদের বর্তমান অবস্থান সারা উপমহাদেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছ। বর্তমান ভারতীয় পার্লামেন্টে হিন্দু মৌলবাদী বিজেপি. সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। মহারাষ্ট্রে শিবসেনা অ-হিন্দুদের প্রতি নির্যাতন চালাচ্ছে। ভারতের সব ক্ষেত্রে আজ হিন্দু মৌলবাদীদের প্রবল দাপট। ভারতীয় রাজনীতির অসাম্প্রদায়িক উদারপন্থী গ্রুপটি হিন্দু মৌলবাদের প্রসার রোধ

www.pathagar.com

করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে গত দু'দশক ধরে। তারপরও তারা হেরে যাচ্ছে। এর একটি বড় কারণ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরেও উগ্র মৌলবাদী হিন্দুরা দৃঢ় বর্ণচোরা-আসন গেড়ে বসেছে। দ্বিতীয় কারণটি সম্ভবত আরো বিপদজনক: উদারপন্থী ভারতীয় দলগুলোর নেতাদের একাংশ মুখে যতই ভারতের অসাম্পদায়িক অবস্থানের কথা বলুন না কেন জ্বলন্ত সত্য হচ্ছে এই যে, সাধারণ মানুষদের মধ্যে উগ্র মৌলবাদীদের জনপ্রিয়তা দিন দিনই বাড়ছে। গত সাধারণ নির্বাচন তার বড় প্রমাণ। এর পরিষ্কার অর্থ হলো ভারতীয় হিন্দু জনগণ দিনে দিনে উগ্রপন্থী হিন্দু মৌলবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বেও জায়গা করে নিয়েছে উগ্র হিন্দুরা।

কংগ্রেস ও ভারতের আজকের পরিস্থিতিরও সূত্র পাওয়া যাবে ইতিহাস থেকে। এ দেশটির জন্মলগ্নের বিপুল উদ্দীপনা আর উৎসবেও হিন্দু মৌলবাদীদের ছায়া পড়েছিলো। তখন ভারতের নেতৃত্ব ছিলো পন্ডিত নেহেরুর মতো মানুষের হাতে, যিনি ভারতের অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। নেহেরু সারা জীবন চেষ্টা করে গেছেন যেন ভারত সাম্প্রদায়িকতার কালিমায় লিপ্ত না হয়। দেশের ভেতরে যা কিছু ঘটেছে তিনি দৃঢ় চিত্তে তা দমন করার চেষ্টা করেছেন। নেহেরু সেই ব্যাক্তি যিনি পশ্চিমাদের কবল থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে রক্ষা করার জন্য যুগোশ্লাভিয়ার টিটো, মিশরের নাসের, ইন্দোনেশিয়ার সুকার্ণো এবং চীনের চৌ এন লাই-এর সাথে মিলে নির্জোট আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। অথচ ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাকমুহূর্তে তিনিও মৌলবাদের দীর্ঘ ছায়া এড়িয়ে যেতে পারেননি।

১৯৪৭ সালের আগস্টের সেই উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলোতে পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত হয়েছিলো 'স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলনের আগে সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা খাঁটি হিন্দু মতে অনুষ্ঠান করে নেহেরু এবং কেবিনেটের বিভিন্ন সদস্যদের অভিষেক সম্পন্ন করা হবে। এ উদ্দেশ্যে ১৪ই আগস্ট তানজোর থেকে প্রধান পুরোহিতের প্রতিনিধি দল এলো। সকাল থেকে পন্ডিত নেহেরু হিন্দু ধর্মের নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেন। সন্ধ্যায় এসব ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র মিছিল অগ্রসর হয়ে হিন্দু ধর্মের রাজাদের অভিষেকের নিয়মানুযায়ী নেহেরুর পায়ে পবিত্র পানি আর ধান-দুর্বা ছিটিয়ে দিলেন। পবিত্র ছাই দিয়ে

www.pathagar.com

পন্ডিতজীর কপালে তিলক এঁকে দেয়া হলো। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ বর্ষিত হলো তাঁর ওপর।

রাতে ড: রাজেন্দ্র প্রসাদের বাড়িতে পবিত্র অগ্নিকুন্ড জ্বালিয়ে তার সামনে বসলেন নেহেরু। নারীরা আগুনের চুতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে মন্ত্র পড়তে পড়তে নেহেরুর প্রতি আর্শীবাদ বর্ষণ করলেন। শেষে সবচেয়ে বয়স্কা মহিলাটি নেহেরু, মন্ত্রীসভার সব সদস্য এবং পার্লামেন্ট মেম্বারদের কপালে আবারো তিল্লি একেঁ দিলেন। এর পর নেহেরু এসেম্বলী হলে গিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন।[১] সেখানে তিনি অনেকবার অনেকভাবে একটি কথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, ভারত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়।

ভারত কখনো হিন্দু রাষ্ট্র ছিলো না। নেহেরু নিজেও তো সচরাচর ধর্ম কর্ম করতেন না। তবু তাঁকে হিন্দু ধর্মের এসব আচার অনুষ্ঠান পালন করতে হয়েছিলো। ভারতের মুসলমানদের কথা মনে রেখেও নেহেরু তা এড়াতে পারেননি। কংগ্রেসের এই চরিত্র অবশ্য কখনোই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। হিন্দু মৌলবাদের প্রতি কম বেশি ঝোঁক দেখা গেছে নেহেরুর মেয়ে ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যেও।

সত্তরের দশকে ইন্দিরার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস(ই) জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করলে ইন্দিরা গান্ধী ডানপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতা থেকে পতনের সম্ভবনা রোধ করেন বটে কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে কংগ্রেসের পতন শুরু হয়। পরবর্তীতে রাজীব গান্ধীও একই কৌশল অবলম্বন করে কংগ্রেসের হাতকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চালান। এ সুযোগ কাজে লাগায় মৌলবাদীরা। ইতোমধ্যে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের মনোভাবেও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। কংগ্রেসের এ দশকের তৎপরতা বিবেচনায় রাখলে এ দলটির অসাম্প্রদায়িক অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবেই।

বাবরী মসজিদ ধ্বংস, বোম্বের দাঙ্গা, বোম্বের মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের উৎখাতের জন্য মৌলবাদী রাজ্য সরকারের প্রকাশ্য তৎপরতা ইত্যাদি

১। B. F. Karaka, *Betrayal in India*, p-38-39।

www.pathagar.com

অস্বাভাবিক পরিবর্তনে কংগেসের প্রায়-নিরব ভূমিকা এর অসাম্প্রদায়িক ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কংগ্রেসের ওপর এখন আর ভারতীয় মুসলমানদের আস্থা তেমন একটা নেই। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার সময় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে। ফলে মুসলমানরা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, কংগ্রেস আর সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবে না।

ভি.পি সিং ক্ষমতায় থাকা কালেও বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয়। তৎকালীন ভারতীয় সরকার তা প্রতিরোধ করতে পেরেছিলো। কংগ্রেস তা করেনি। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে অহঙ্কারের সাথে, সদম্ভে পূর্ব-ঘোষনা দিয়ে; এটি কোনো আকস্মিক প্রতিক্রিয়ার ফল নয়। এর পরপরই সারা দেশে প্রায় ৫০টির মতো মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়। কংগ্রেসীরা মুখে বলে তারা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে। প্রচার-প্রচারণায় ভারতীয়দের প্রায় সবাই অসাম্প্রদায়িক। এরপরও বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলায় ভারতীয় মুসলমানদের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের দাবীদার কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালে উগ্র হিন্দুরা কি করে বাবরী মসজিদ ভাঙতে পারলো; একমাস আগে থেকে ঘোষনা দিয়ে কি করে ওরা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ঘৃণ্য প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখলো, কি করে সেখানে রামমন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হলো? এবং তাদের সবচেয়ে বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা, আজো কেন বাবরী মসজিদ পুনর্নির্মিত হয়নি ?

বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পর বোম্বেতে ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে এবং ৯৩-এর জানুয়ারীতে দু'দফায় মুসলিম নিধন চলে। এ ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত হয় শ্রীকৃষ্ণ কমিশন। শিবসেনা সরকার ক্ষমতায় এসেই এই কমিশন বাতিল করে দেয়। কারণ কমিশনের হাতে এমন প্রমাণ ছিলো যে, মুসলিম নিধনে প্রধানত শিবসেনারাই জড়িত ছিলো। ভারতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ওপরও চলছে অবর্ণনীয় নির্যাতন-সন্ত্রাস। শিবসেনারা প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বলেছে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ না করলে অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে ভারতে থাকতে দেয়া হবে না। খ্রীষ্টান মিশনারিগুলোতে হামলা করে সিস্টারদের ধর্ষন করে খূন করার মতো ঘটনাও ঘটছে। গুজরাওলা, বোম্বে, দেওয়াস, গাজিয়াবাদ, কারিয়াল প্রভৃতিতে দিন

www.pathagar.com

দুপুরে এধরনের ঘটনা ঘটছে।[১] এর থেকে আন্দাজ করা যায় ভারতে শুধু মুসলমান নয়, অ-হিন্দু মাত্রই বিপদগ্রস্ত।

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে ক্ষমতায় আছে বামপন্থীরা। অথচ সেই পশ্চিমবঙ্গেই মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও অবিচার বৃদ্ধি পাচ্ছে অব্যাহতভাবে। গত এক দশকে যা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে তা থেকে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও সাধারণ হিন্দুদের মনোভাব সম্পর্কে ধারনা করা যায়। নীচের কয়েকটি ঘটনা থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

ভারতে ক্রিকেট একটি জাতীয় খেলা। এ নিয়ে রাজনীতির মতই হাটে বাজারে, রাস্তাঘাটে তমুল আলোচনা, তর্কবিতর্ক চলে। সেই ক্রিকেটের একটি ঘটনায় ভারতীয় ক্রিকেটের অনুরাগীদের হিন্দু মন প্রবল হয়ে উঠেছে।

ক্রিকেটের বয়স দক্ষতা ও ফর্ম থাকা সত্ত্বেও জাতীয় দল থেকে বাদ দেয়া হয় সাবা করিম ও সৈয়দ কিরমানীকে। তখন পশ্চিমবঙ্গের কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলীকে যখন জাতীয় দলে নেয়া হলো না তখন বাঙালির মনোভাব পাল্টে গেলো। তারা সৌরভের পক্ষে মিছিল করলো, বিবৃতি দিলো। তখন পাকিস্তানের সাথে ভারতের খেলা চলছিলো। কলকাতার মাঠে অনুষ্ঠিত সে খেলায় বাঙালি হিন্দুরা পাকিস্তানকে সমর্থন করে। কারণ বাঙালি সৌরভকে বাদ দেয়ায় তারা ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে রাজী। বাঙালির এ ভারত-বিরোধিতার খবর এসেছে পত্রিকায়। অধিকাংশ কলামিষ্ট তাতে সমর্থনও জানিয়েছে। সৈয়দ কিরমানী বা সাবা করিম হিন্দু নয় বলেই তাদেরকে বাদ দিলে বাঙালি হিন্দুদের কিছু আসে যায় না।

হাজার বছরেরও আগে থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা পবিত্র ঈদ-উল-আজহার দিনে গরু কোরবানী ও নামাজ আদায় করে আসছে। এটি

১। K. S. Narayanam, *A Mission of Hate,* SUNDAY, April1 16-22।

www.pathagar.com

তাদের ধর্মীয় উপাসনার অংশ, যেমন হিন্দুদের উপাসনার একটি ফর্ম হচ্ছে মাটি দিয়ে মূর্তি বানিয়ে তার সামনে ঢোল-কর্তাল নিয়ে নেচে নেচে হরিনাম করা। দুই ধর্মের দু'ধরণের উপাসনা দেখে আসছি আমরা ছেলে বেলা থেকে। প্রায় এক যুগ আগে ভারতের হিন্দু মৌলবাদীদের একটি ক্ষুদ্র সংগঠন "ওম বীরাঙ্গনা" মুসলমানদের গরু কোরবানী বন্ধের আদেশ প্রদানের আবেদন জানায়। ভারতের অনেক রাজ্যে গরু জবাই নিষিদ্ধ করা হয়। বাকী ছিলো পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা।

পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত কমিউনিষ্ট সরকার মুসলমানদের ভোট হারাবার ভয়ে কোরবানী বন্ধের আদেশ মেনে না নিয়ে তা বাতিলের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে। কারণ ক্ষমতায় থাকার জন্য সংখ্যালঘু মুসলমানদের ভোটটা তাদের দরকার। আশ্চর্যের বিষয় সুপ্রীম কোর্ট রাজ্য সরকারের আবেদন অনুযায়ী প্রায় এক যুগ ধরে সরকার পক্ষের উকিলকে সময় দিয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বক্তব্য হলো সি.পি.এম সরকার কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার বিষয়টি আসলে লোক দেখানো। মুসলমানদের ভোটের কথা মনে রেখেই সি.পি.এম-বিচার বিভাগ পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি মামলাকে একযুগ আটকে রাখার নজীর স্থাপন করেছে।

কিন্তু মৌলবাদীদের তরফ থেকে চাপ অব্যাহত থাকে। ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে কলকাতায় শহীদ মিনারের প্রাঙ্গনে এক বিরাট জন সভায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিংহল সদম্ভে ঘোষনা করেন যে, গরু জবাই বন্ধ না হলে হিন্দুরা মুসলমানদের মাথা কেটে মা কালীর পায়ে উৎসর্গ করবে। তিনি বলেন, যে সব হিন্দু আগে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হয়েছে তাদেরকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা হবে। অশোকের ফ্যানাটিক বক্তব্যই প্রচার করে পত্রিকাগুলো।

গত বছর সুপ্রীম কোর্ট গরু জবাই নিষিদ্ধ ঘোষনা করে। তবে একটু ফাঁক রেখে দিয়ে বলে যে, মুসলমানরা ইচ্ছে করলে কসাইখানায় গিয়ে গরু জবাই করে নিয়ে আসতে পারে। এ বিষয়ে মুসলমানদের যুক্তি প্রণিধানযোগ্য। তারা বলছে সুপ্রীম কোর্ট জানে যে, কসাইখানায় গরু জবাই সম্ভব নয়। কারণ কলকাতায়

www.pathagar.com

গরু জবাই করার জন্য কসাই খানা আছে মাত্র দু'জায়গায় : টেংরায় আর মেটিয়া বুরুজে। কলকাতার লক্ষ লক্ষ মুসলমান যদি সেখানে গরু জবাই করতে যায় তাহলে দু'মাস আগে থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এজন্য মুসলমানরা সরকারের সাথে যোগাযোগ করে এবং সরকারী আশ্বাসে নিজেদের পাড়ায় গরু জবাইয়ের চেষ্টা করে। পরে এদের অনেকে সরকারেরই পুলিশের হামলার শিকার হয়।

এ বছরও বহু জায়গায় হিন্দুরা হামলা করে পবিত্র ঈদের অনুষ্ঠান নষ্ট করে দেয়। মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের কালিকাকুন্ড গ্রামে কোরবানী হয়েছে জানতে পেরে পুলিশের সহযোগিতায় গ্রামের হিন্দুরা মুসলমানদের ঘরে ঘরে তল্লাশী চালায়। একটি বাড়িতে গরুর মাংস পাওয়া গেলে সারা গ্রামে বিপর্যয় নেমে আসে। হিন্দুরা মুসলমানদের অনেক বাড়িঘরসহ কালিকাকুন্ডের একমাত্র মসজিদ এবং মাদ্রাসাটি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ এসেছে কোনো কোনো পত্রিকায়। এলাকাবাসী মুসলমানরা উঁচুমহল পর্যন্ত অভিযোগ করেছে। কোনো প্রতিকার হয়নি। ফলে কালিকাকুন্ডের মুসলমানরা এখনো সে বিভীষিকার মধ্যে বসবাস করছে।

মুসলমানদের ওপর মৌলবাদী হিন্দুদের অত্যাচারের আরেকটি ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে আজান নিয়ে । ভারতে শব্দদূষণ রোধের নামে কেন্দ্রিয় সরকারের পরিবেশ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড মাইকে আজান প্রচারে নিষেধ জারী করে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার দোহাই দিয়ে উক্ত বোর্ড যে সব নিয়ম কানুন প্রচার করে তা মূলত: আজানের বিরুদ্ধে যায়। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ৬৫ ডেসিব্‌ল-এর বেশি শব্দ করা যাবে না, করলে তা শব্দদূষন নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় অপরাধ বলে গণ্য হবে। এ আইনের মধ্যে আজানকে ফেলে মাইকে আজান নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়। কারণ দেখা গেছে খালি গলার শব্দও অনেক ক্ষেত্রে ৬৫ ডেসিব্‌ল-এর চেয়ে বেশি হতে পারে। কাজেই মাইক ব্যবহারের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আসল ঘটনা হলো রাজনৈতিক মিটিং, মিছিলে ভাড়াটে লোকদের পাশব চিৎকারের মধ্য দিয়ে রঙবেরঙের শ্লোগান প্রচার, স্টেশনের মাইক,

www.pathagar.com

কলকারখানার সাইরেন ও মেশিনের শব্দ, গাড়ির যথেচ্ছা হর্ণ, উচ্চস্বরের গান বাজনা- এগুলোই মূলত: শব্দদূষণের জন্য দায়ী। এসব শব্দ সারাদিনই তৈরি হতে থাকে। কান ঝালাপালা করে উঠলেও তার থেকে নিস্তার নেই। সে তুলনায় মাইকে আজান প্রচার করার সময়টুকু একেবারেই সামান্য, সারাদিনে বড়জোর মিনিট পনর। তাছাড়া আজানের বিশেষ সুরময় ধ্বনি কারো বিরক্তি উৎপাদন করার কথা নয়। এরপরও মাইকে আজান প্রচার নিষিদ্ধ করা হলো কেন? কলকারখানা, মিটিং-মিছিল, পুজোর আরতিতে তো কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।

এখানে রাজ্য-সরকারের ভূমিকাটি যাচাই করে দেখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৫% লোক মুসলমান। ক্ষমতার প্রশ্নে তাদের ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান। সংখ্যালঘুদের ভোট যাতে হাত ছাড়া না হয়ে যায় সেজন্য কমিউনিষ্ট সরকার, কোরবানী মতই, আজান নিয়েও হাইকোর্টে আপীল করার কথা ঘোষণা করে। হাইকোর্টের বিচারপতিরা মামলাটি খারিজ করে দেন।

রায়ে বিচারপতিরা বলেন যে, ইসলামে এমন নির্দেশ নেই যে মাইকে আজান দিতে হবে। কোরানেও মাইকে আজান প্রচারের আবশ্যিকতা সম্পর্কে উল্লেখ নেই। তাদের আরেকটি যুক্তি হলো মাইকে আজানের জন্য ছাড় দিতে হলে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও তাদের ব্যাপারে ছাড় চাইবে। বিচারপতিরা এসব কারন দেখিয়ে মামলাটি খারিজ করে দেন।

বিচারপতিদের উপরোক্ত বক্তব্য মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করার মতো। কারণ, প্রথমত, সাধারণের মধ্যে এমন একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে সারা পৃথিবীতে এখনো বিচার বিভাগের লোকজন প্রশ্নাতীতভাবে নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক। আজান বিষয়ক মামলাটির পরিণতি প্রমাণ করে তা সত্যি নয়। দ্বিতীয়ত, বিচারপতিদের উক্ত বক্তব্যের মধ্যে ভারতের উগ্র মৌলবাদী হিন্দুদের একশ্রেনীর মনোভাবের সুক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে।

ইসলাম এবং কোরান প্রচারিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় তেরশ' বছর আগে। সেখানে মাইক্রোফোনের প্রসঙ্গ থাকার কথা নয়। বিশ শতকে সারা পৃথিবীতে

www.pathagar.com

লোক বসতি ও কলকারখানা অত্যধিক বেড়ে গেছে। নানা ধরণের শব্দের কারণে খালি গলার আওয়াজ পাশের বাড়ি থেকে শোনাও মুশকিল। সাধারণত মসজিদগুলো গড়ে ওঠে একেকটা মহল্লাকে কেন্দ্র করে। একটি মসজিদের আওয়াতাধীন এলাকা যথেষ্ট বিস্তৃত। খালি গলায় একটি লোক যতই চিৎকার করুক তা একটি মহল্লার এক দশমাংশ বাড়িতেও ঠিকমতো পৌঁছাবে না। কলকাতার মতো গিজগিজে শহরে তো সে প্রশ্ন উঠেই না। এ কারণে, যে বিশ্বাসী মুসলমান তার ধর্ম কর্ম যথাযথভাবে পালন করতে চায় তার কাছে আজানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, এর বিকল্প নেই। সেই আজান নিষিদ্ধ করে দেয়ার অর্থ হলো মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মকর্মে বাধা দেয়া। আর এ প্রসঙ্গে কোরানে আজানের উল্লেখ না থাকার যুক্তি দায়িত্ববোধহীন কথাবার্তা অথবা স্থূল ঠাট্টার পর্যায়ে ফেলা যায়। এ ধরনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের প্রতি এক শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুদের অবজ্ঞা ও ঘৃণাই প্রকাশ পায়। হাইকোর্টের বিচারপতিদের মুখে এ ধরণের কথাবার্তা তদের পরিপাটি ব্যাক্তিত্বের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক জন্তুটিকেই উন্মোচন করে দেয়।

তাদের দ্বিতীয় যুক্তিটিও পক্ষপাতদুষ্ট। ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে আজানের মতো এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যা দ্বারা লোকজনকে ইবাদতে আহ্বান করা হয়। সারাদিনে আজান প্রচারিত হয় বড়জোর ১৫ মিনিট। হিন্দুদের পুজার ঢোলবাজনা হৈ হুল্লোড় চলে রাতদিন ২৪ ঘন্টার হিসেবেও একটানা দিন সাতেক। অনেক লোক মিলে নেচেকুদে পুজার আরতি করে, হরি নাম করে। আনন্দের জন্য। তরুণ ছেলে মেয়েরা গান বাজনা করে। সে সময় কলকাতার ছেলে মেয়েরা সারা শহরে বিভিন্ন রাস্তা বন্ধ করে অসংখ্য মাইক লাগিয়ে কি যে এলাহী কান্ড করে সপ্তাহ ধরে তা অনেকেরই জানা।

আজান আর গান বাজনার তুলনা হতে পারে না। বিচারপতিদের এ বক্তব্য ধোপে টিকে না যে, আজানের ব্যাপারে ছাড় দিতে হলে অন্য ধর্মের লোকজনকেও ছাড় দিতে হবে। কারণ অন্য ধর্মে ইবাদতের জন্য এভাবে আহবান জানানোর রীতি নেই। এরপরও মাইক্রোফোনে আজান দেয়া বন্ধ করে রাখা হয়েছে। হাইকোর্ট আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। যেসব ইমাম মাঝে

www.pathagar.com

মধ্যে মাইকে আজান দিচ্ছেন তাদেরকে আদালতে তলব করা হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অমান্যের অভিযোগ আনা হচ্ছে।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের অবস্থাও তুলনা করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বরাবরই বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক দেশ বলে প্রমাণ করার প্রয়াস পান। তাদের ভাষায় 'বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। এব্যাপারে সরকারের ভূমিকা সহায়ক। এ ধরণের নির্যাতন সম্পর্কে আইন নিরব', ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থান বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে মাসের অনেকগুলো দিনে পুজা-অর্চনা করেন। ঢোল-করতাল সহযোগে সবাই মিলে হরিনাম করা হয়। বহু গ্রামে মাসের অধিকাংশ দিনে হিন্দু সম্প্রদায়ের তরুন-যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সন্ধা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরে কীর্তন করেন, ঢোল-করতাল বাঁশি বাজিয়ে হরিনাম করেন। গ্রামের মুসলমানরা সে কীর্তন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। সে কীর্তনের শব্দ উঁচু পর্দার আওয়াজের শ্রেণীতে যে পড়ে তা বলা বাহুল্য, মাইক্রোফোনের আওয়াজের চেয়ে তা কম তো নয়-ই বরং কোল-জুরি আর সম্মিলিত গলার আওয়াজ মাইক্রোফোনকে ছাড়িয়ে যায় অনেক সময়। ছেলেবেলা থেকে আমারা এ রকম দেখে এসেছি। এ নিয়ে কোথাও গোলমাল হয়েছে বলে শুনিনি। এখনো এ রীতিই চলছে। সরকার, কোনো রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় সম্প্রদায় কীর্তন বন্ধের দাবী তুলেনি। দীর্ঘ সময়ব্যাপী কীর্তনের তুলনায় আজানের সুর কিছুই নয়। অথচ ভারতে মাইক্রোফোনে আজান প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

আজান আর কোরবানীর ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের আশ্রয় বলা হয় যে বিচারালয়কে, ভারতে তাও আজ সাম্প্রদায়িকতার আবর্জনায় ভরে উঠেছে। অথচ এসব নষ্টামীর বিরুদ্ধে কোলকাতার বুদ্ধিজীবীরা বিশেষ কোনো কথা বলেননি। এমন একটা সময় গেছে যখন গরু জবাইয়ের অপরাধে মুসলমান প্রজাদেরকে সপরিবারে প্রাণ দিতে হয়েছে। গরুর মাংসতো পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের প্রিয় খাদ্য! আর্যরাও গরু খেত। এরপরও

www.pathagar.com

আজকের দিনে এ সভ্য সময়ে যে এরকম জঘন্য কার্যকলাপ ঘটে চলেছে সে লজ্জা আমাদের সবার, গোটা মানব সভ্যতার।

ভারতের মুসলমানদের অভিযোগ সরকারীভাবেও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছে। বিভিন্ন এলাকার মুসলমানরা অভিযোগ করছে যে, ওয়াকফ করা সম্পত্তি হাতিয়ে নিচ্ছে সরকার এবং স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা। মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের অভিযোগের ফলে একটি ওয়াকফ তদন্ত কমিশন ঘটিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার মধ্যেও চলছে তালবাহানা। খোদ ওয়াকফ বোর্ড বলছে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯১-৯৫ সময়ের মধ্যে মোট ১৮২টি ওয়াকফ সম্পত্তি বেদখল হয়েছে। আর রাজ্য সরকারের নিযুক্ত তদন্তকারী রিপোর্ট করেছে ১২৬ টি সম্পত্তি হস্তান্তরের। এ থেকেই রাজ্য সরকার ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের খেলাটি বোঝা যায়। এসব নিয়ে পত্রিকায় লেখা লেখি হচ্ছে প্রচুর, কথাবার্তা ও আলোচনা চলছে। শুধু কাজটাই হচ্ছে না।

প্রথম দিকে পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের ওপর আস্থা রেখেছিলো সংখ্যালঘুরা। গত এক যুগের বামফ্রন্টের ভূমিকা সংখ্যালঘুদের সে বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করেছে। কারন তারা দেখছে যে ফ্রন্টই ক্ষমতায় আসুক মুসলমানদের ভাগ্যের কোনো হেরফের হচ্ছে না, নির্যাতনের মাত্রা কমছে না। পরিসংখ্যানে দেখা যায় পশ্চিমবাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ প্রায়। অথচ সরকারী চাকুরীতে মুসলমান চাকুরীজীবী মাত্র ২ শতাংশ। গত দশ বছরে কলিকাতা করপোরেশন ৭৪৩৬ জন কর্মচারী নিয়োগ করেছে, তার মধ্যে মাত্র ১৬১ জন মুসলমান। তথ্য বিভাগে নিযুক্ত ৭৩৭ জন কর্মচারীর ১৪ জন মুসলমান। পশুপালন বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ২০০০ কর্মচারীর মধ্যে ৬৩ জন মুসলমান জায়গা পেয়েছে । স্বাস্থ্য দপ্তরের ১৪৫০ জনের মতো লোক চাকুরী পেয়েছে। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ২৪ জন। হ্যান্ডলুম টেক্সটাইলের ১৬৭৭টি পোস্টের মধ্যে ৫০ জন মুসলমান স্থান পেয়েছে। মুসলমান ছেলেরা চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করলেও তাদেরকে

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকারে ডাকা হয় না। গত বছর বিধান সভার বর্ষাকালীন অধিবেশনে কংগ্রেসের এম. এল. এ সুলতান আহমদ এসব তথ্য উপস্থাপিত করেন।

সে অধিবেশনেই কংগ্রেসরই বিধায়ক তাপস ব্যানার্জীর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ব্যাংকগুলোও সরকারের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে সহযোগিতা করছে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাংকগুলো মুসলমানদেরকে ঋণ দেয় না। দীর্ঘদিন থেকে আসানসোলের মুসলমানদের ওপর বিভিন্ন নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য কয়েক বছর আগে ভারতে একটি র‍্যাপিড একশন ফোর্স গড়ে তোলা হয়। প্রথমে সিদ্ধান্ত হয় যে, এ ফোর্সের কমপক্ষে ২০ শতাংশ থাকবে মুসলমান সদস্য, সব মিলিয়ে ৫০ শতাংশ সদস্য নেয়া হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো থেকে। কার্যত তা হয়নি। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস বি চ্যাবন বিজেপিকে খুশী করার জন্য এর অধিকাংশ সদস্য হিন্দুদের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন। এদেরকে নেয়া হয়েছে বি.এস.এফ, সি.আর.পি.এফ প্রভৃতি আধা সামরিক বাহিনী থেকে। এর সুফলও পেয়েছে হিন্দু কর্তৃপক্ষ। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার সময় এই র‍্যাপিড একশন ফোর্স মাত্র দু'মাইল দূরে ছাউনি ফেলে আরাম করছিলো। শুধু র‍্যাপিড একশন ফোর্স কেন সেনা বাহিনী, পুলিশ বাহিনীসহ সর্বত্র এই বৈষম্য। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমান নেই।

বেসরকারী কোম্পানীগুলোতে মুসলমানদের অবস্থান আরো খারাপ। ভারতের প্রথম সারির ৯০টি কোম্পানির ৮৩২ জন পরিচালকের মধ্যে মুসলমান পরিচালক মাত্র ১১ জন। এ তথ্যে দেখা যায় বেসরকারী কোম্পানিগুলোর পরিচালক পদে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১.৩২ ভাগ মাত্র। অন্যান্য ছোটো খাটো ব্যবসাতেও মুসলমানদের অবস্থান মোটামুটি এরকমই।[১]

একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার প্রস্তুতকৃত রিপোর্টে('ইন্ডিয়া এ্যাব্রোড নিউজ সার্ভিসেস'-এ মাধ্যমে প্রচরিত) ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে বলা হয় যে, ঐ সংস্থা মনে করে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ সুপ্ত ছিলো শুরু

১। তথ্যগুলো দিল্লীর উর্দু ভাষার পত্রিকা *'নয়ী দুনিয়া'* থেকে নেয়া।

www.pathagar.com

থেকেই। তাদের মতে সত্তরের দশকে ইন্দিরা গান্ধী নিজেই সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন উগ্র হিন্দুদের ভোট পাওয়ার জন্য। রাজীব গান্ধীও এ পথে রাজনীতি করে গেছেন। রিপোর্টে এও উল্লেখ করা হয় যে, বাবরী মসজিদ ধ্বংসকরণ এবং সংখ্যালঘুদের ওপর বর্তমান নির্যাতনে সরকারের ভূমিকা নিরপেক্ষ নয়।

কেন্দ্রিয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার যে যথার্থ ধর্ম নিরপেক্ষ নয় তা আরো একবার বোঝা গেছে বোম্বের চার লক্ষ মুসলমানকে 'বহিরাগত' আখ্যা দিয়ে তাদেরকে ভারত থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে বোম্বের প্রায় চার লক্ষ মুসলিম নাগরিককে একটি করে নোটিশ হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাতে বলা হয়, তিনি যে ভারতের নাগরিক— বহিরাগত নন তা অমুক তারিখের মধ্যে প্রমাণ করতে হবে। এদের মধ্যে আছেন উর্দু-ভাষার বিখ্যাত বিপ্লবী কবি আলী সর্দার জাফরিও। জাফরি ভারতের সুপরিচিত বামপন্থী রাজনীতিবিদ। কবি হিসেবে পদ্মশ্রী পুরষ্কার পেয়েছেন। এরপর আর তার ভারতীয় নাগরিকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠার কথা নয়। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই জাফরিকেই সন্দেহের নোটিশ ধরিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ভারতের সমস্ত মুসলমানকে এবং নীতিবান নাগরিককে হতবাক ও সন্ত্রস্ত করে তোলেছে। আর কাশ্মীরে ৫০ বছর ধরে কি ঘটে চলেছে তা তো সবারই জানা।

বাংলাদেশীরা ভারতে গেলে ওখানকার মানুষজন যে আচরণ করে তাদের সাথে তা এক কথায় প্রচন্ড ঘৃণাযোগ্য। বহু বাংলাদেশী ভারত থেকে ঘুরে এসে অভিযোগ করেছেন তাদের সাথে সীমান্তে, বাসে, ট্রামে, রেলে, হোটেলে সর্বত্রই রুক্ষ আচরণ করা হয়েছে। এবং তা করা হয়েছে নাম ধাম জানার পর। এ ধরণের আচরণ করা হয় সাধারণ সঙ্গতি সম্পন্ন লোকদের ওপর যারা সস্তা হোটেলে থাকতে এবং সস্তা যানবাহনে চড়তে বাধ্য। অনেক বাংলাদেশী ভারতে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করার পর মানুষের অনুসন্ধানের জবাবে নিজেদের এমন ডাক নাম উদ্ভাবনের চেষ্টা করে যা হিন্দুদের নাম বলে মনে হয়। এতে নাকি সুফলও পাওয়া যায়। একটি ঘটনার বিবরণ এসেছে ঢাকার

www.pathagar.com

নামকরা দৈনিক "আজকের কাগজ"-এর ১২ই ফাল্গুন (১৪০৩) সংখ্যায় এম.এ. হীরার "সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী---" শিরোনামে প্রকাশিত একটি ফিচারে। লেখাটির অংশ বিশেষ তুলে ধরছি:

আমার এক বন্ধু, হুমায়ুন রেজা, '৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাইগ্রেট করে এদেশে এসে সেটল করেছেন। অনেক দিন বাদে নিজের দেশে গিয়েছিলেন। হাওড়া থেকে ট্রেনে বীরভূম যাচ্ছিলেন। সহযাত্রীদের সঙ্গে চুটিয়ে আলাপ চলছিলো। পরিচয়ের পালার মাঝে হুমায়ূন সাহেবের নাম শুনে একজন সহযাত্রী বলে উঠলেন, ও আপনি মুসলমান। আপনার কথাবার্তা শুনে এতোক্ষণ তো আপনাকে মশাই বাঙালি ভাবছিলাম। হুমায়ূন সাহেব বললেন, হ্যাঁ, ভাই, আমি বাঙালি মুসলমান।

২৪শে মাঘ, ১৪০৩ দৈনিক ইনকিলাবে-এ সত্যসন্ধ প্রশ্ন তুলেছেন যে, কোলকাতার বুদ্ধিজীবীদের কাছে বাঙালি মুসলমান কি এখনো বাঙালি হতে পারেননি ? উপরোক্ত ঘটনাই প্রমাণ করে যে, সত্যসন্ধ যথার্থই প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, এ শতাব্দিতে শরৎ চন্দ্রের 'বাঙালি এবং মুসলমান ছেলেদের মধ্যে ফুটবল খেলা' আর বোধ করি হবে না। এখন বাঙালি ছেলেদের মধ্যেই ফুটবল খেলা হবে। কারণ সাতচল্লিশে দেশ ভাগাভাগির সময় এই মুসলমান বাঙালিরাই ভারত পাকিস্তানের বাইরে সার্বভৌম বাঙলা রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন দেখেছে, আন্দোলন করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র মুসলমান বাঙালিরাই ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে, ভাষাকে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিতি করেছে। ভাষা সৈনিক হয়েছে। হাজার হাজার বছর পর বাঙালির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করেছে, ৩০ লাখ লোক প্রাণ দিয়েছে, ৩ লাখ মা-বোন ইজ্জত দিয়েছে। পৃথিবীর বুকে বাঙালি ভাষাভাষী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এতো কিছু করার পরও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালির কাছে বাংলাদেশের মুসলমান নাগরিকরা বাঙালি হতে পারেননি। কারণ শতবর্ষ আগে বঙ্কিম চ্যাটার্জী বলেছিলেন যে, বাঙলার মুসলমানরা বাঙালি নন। বাঙালি হতে হলে তাকে অবশ্যই আর্যায়িত হিন্দু হতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী বাংলার মুসলমানরা আর্যায়িত হিন্দু হতে না পারায় আজো বাঙালি হয়ে ওঠেনি। - - - - - - - -

১৯৭৩ সালে বসন্ত চট্টোপধ্যায় তার "ইনসাইড বাংলাদেশ টুডে" পুস্তকে লিখেছিলেন যে, শেখ মুজিবের বাঙালি আর আমাদের বাঙালি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। তার বাঙালি হচ্ছে একটা রাজনৈতিক সত্তা এবং ধর্মে তা মুসলমান। আমাদের বাঙালি একটা সাংস্কৃতিক সত্তা এবং ধর্মে তা হিন্দু।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ হায়দার আকবর খান রনোও এরকম একটি ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন '৭১ সালের অসহায় সময়ে। তিনি এবং তার বন্ধু বাংলাদেশের সুনামধন্য রাজনীতবিদ কাজী জাফর আহমদ আর জাফর আহমদের বাচ্চা মেয়ে—এই তিনজন আগরতলার সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তারা যেখানে থামেন সেটি ছোট্টো মফস্বল শহর বা বাজার ধরণের। লোকে ঠাসাঠাসি, বেশিরভাগই বাংলাদেশি রিফিউজি। গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনজনে। তিনজনই ক্ষুধার্থ।

কিছুক্ষণ পর কাজী জাফরের বাচ্চা মেয়েটি কাঁদতে শূরু করে খাবারের জন্য। পাশেই একটা টিউবওয়েল। রনো সাহেব বাচ্চাটিকে নিয়ে সেখানে গেলেন পানি খাওয়ানোর জন্য। টিউবওয়েলেও লাইন। রনোর আগে পড়লো একজন বুড়ি মহিলা। পাম্প দিতে তার কষ্ট হচ্ছে, সময় লাগছে বেশি। তা দেখে রনো বললো, মাসীমা আমাকে দিন, আমি পাম্প করছি, আপনি কলসি ভরে নিন। কলসি অর্ধেকটা ভরার পর মহিলা রনোর নাম জানতে চাইলেন এবং যথারীতি জাতের প্রশ্নও উঠলো। রনো মুসলমান শুনে মহিলা কিচ্ছু না বলে কলসিটা উপুড় করে সম্পূর্ন পানি ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরে রনো যাচ্ছিলেন ট্রেনে করে। পাশের এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন রনো জয়বাংলা দেশ থেকে এসেছে কিনা। রনো হ্যাঁ সূচক জবাব দিলো। ভদ্রলোক চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "আমরা এই যে এতো কিছু করছি, নেড়েরা(বাঙালী মুসলমানরা) শেষ পর্যন্ত কথা রাখে কি না কে জানে। নেড়েদেরকে বিশ্বাস করা কঠিন!"

আরেক বামপন্থী রাজনীতিবিদ কমরেড নবী। বর্তমানে বাংলাদেশ-কিউবা মৈত্রী সমিতির সভাপতি। ১৯৪৯ সালে প্রথম জেলে ঢুকেন। সারা জীবন রাজনীতিতেই কাটলো। বিয়ে করেছেন ব্রাহ্মণ মহিলাকে। তিনি বলেছেন আপাদমস্তক নাস্তিক, কট্টর বামপন্থী নেতাদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেলে তাদের মনের প্রকৃত অবস্থাটা বোঝা যেতো। মুসলমানরা খেয়ে আসার পর তাদের ছোঁয়া থালা-বাসন ভেঙ্গে ফেলা হতো।

www.pathagar.com

এসব বিবরণ শুনলে আন্দাজ করা যায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় আমাদেরকে কোন চোখে দেখে। আমরা, পুরোনো সম্পর্কের টানে, যেসব সঙ্গতি সম্পন্ন হিন্দু বন্ধুদের কাছে যাই তারা এ ধরণের আচরণ করেন না বটে। এরা ব্যতিক্রম, সংখ্যাল্প। এদের দিয়ে দেশ চলে না। যারা ক্ষমতায় তাদের মনোবৃত্তির পরিচয় তো বাবরী মসজিদের ঘটনাই প্রমাণ করে।

তবু ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় বাংলাদেশে যতবারই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ার সম্ভবনা সৃষ্টি হয়েছে ততবারই বাংলাদেশের সরকার, বিশেষ করে সচেতন জনগণের তরফ থেকে তা প্রতিরোধ করা হয়েছে, কখনোই তা বিস্তৃত হতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

ভারতের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের একদল হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের উস্কানিমূলক আচরণ সবসময় পরিবেশ উত্তপ্ত করে রাখে। এঁদের কাজ হচ্ছে ইসলাম ও বাংলাদেশ বিরোধী বাংলাদেশীদেরকে অসাম্প্রদায়িক, মহৎ ও মেধাবী বলে প্রচার করা এবং তাদের কর্মকান্ডে সমর্থন দেয়া, প্রচার মাধ্যমে তাদের কার্যকলাপকে মহৎ বলে তুলে ধরা, তাদের পুরস্কৃত করা ইত্যাদি। বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে এ ঘটনাটি আরো বেশি করে ঘটছে।

কয়েক বছর আগে তসলিমা নাসরীন নামের একটা মেয়েকে নিয়ে একটা এলাহি কান্ড ঘটে গেলো। বাংলাদেশের মৌলবাদীদের কর্মকান্ড, আত্মঘাতী বাংলাদেশী সাংবাদিকদের লেখালেখি এবং সর্বোপরি কোলকাতার বুদ্ধিজীবীদের প্রচার-প্রচারণায় তসলিমা নাসরীন রাতারাতি বিশ্বখ্যাত নারীবাদী লেখিকায় পরিণত হলো। ইউরোপের বুদ্ধিজীবীরা, অন্তত প্রথম দিকে, জানলো বাংলাদেশে মেয়েরা ঘোমটা ছাড়া বেরুলেই তাদেরকে মারাত্মক শাস্তি দেয়া হয়। তসলিমা নাসরীন এ কাজটি সম্পন্ন করে বিশেষ একটি চক্রের সহায়তায়। তাকে আনন্দ পুরস্কারও দেয়া হয়। কারণ যে লেখকই

www.pathagar.com

মুসলমানদের সমালোচনা করবেন বা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বলবেন তার জন্যেই আনন্দ বাজারের দ্বার খোলা।

১৯৯২ সালে ভারতে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেললে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশেও গোলযোগ দেখা দেয়। সচেতন শিক্ষিত সম্প্রদায়, সরকার ও সাধারণ মানুষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে নিতে কয়েকটি হিন্দু এলাকায় মৌলবাদী মুসলমানরা কিছু ভাঙচুর করে। এ সুযোগটি নেয় তসলিমা। সে একটি উপন্যাস লিখে যাতে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের এক জঘন্য বানোয়াট চিত্র তুলে ধরা হয়। স্বভাবতই তা পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গেরই জনৈক লেখকের কাছ থেকে জানা যায় ওখানে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সে উপন্যাসের হাজার হাজার কপি নি:শেষ হয়ে যায়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটি গ্রুপ গচ্ছা দিয়ে ৫০ টাকা দামের বইটি হকারদের মাধমে প্রতিকপি প্রথমে ১০ টাকা পরে ৫ টাকা দরেও বিক্রি করায়।

কোলকাতার লোকদের এ ধরণের পদক্ষেপের সবচেয়ে সর্বনাশা দিকটি এই যে, স্বীকৃতি ও খ্যাতির লোভে অন্যরাও এ পথে পা বাড়াতে পারে। কারণ, বলতে দ্বিধা নেই, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রায় সব ভারতীয় মানুষের মনে দেশ-প্রেমটা এখনো আছে ; কিন্তু এমন অনেক বাংলাদেশী আছে যার কাছে খ্যাতিটা অনেক বেশি লোভনীয়।

কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা তাদের লেখাতেও মুসলমান ও বাংলাদেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্য সংকলন, সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদিতে বাংলাদেশের দু'একজন লেখকের উল্লেখ করেই তারা কর্তব্য সারেন। বলা বাহুল্য, তাদের মোসাহেবী করেন এমন বাংলাদেশী লেখকদের নামই সেখানে থাকে । গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে যে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক ধারা বিকশিত হয়েছে সে ব্যাপারে তারা উদাসীন।

বাংলাদেশের কথা বাদ দিয়ে ভারতের মুসলমানদের কথাই ধরা যাক। ভারতের মুসলমানরা ভারতকে নিজের দেশ বলে ভাবে, সে দেশের প্রতি আত্মার টান

www.pathagar.com

বোধ করে এবং এ কারণেই সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের বৈষম্যমূলক আচরণ সত্ত্বেও বাংলাদেশে আসার কথা ভাবে না। কারণ বাংলাদেশ তাদের দেশ নয়। এরকম উদার যাদের মনোবৃত্তি তাদের মসজিদই ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে জোরেসোরে ঘোষণা দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান লেখকদের প্রতি হিন্দুদের আচরণ কি রকম তার প্রমাণ দেয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের লেখা থেকেই। প্রখ্যাত কবি শাহাদাৎ হোসেন বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। শুধু কবিই ছিলেন না তিনি, উপন্যাসিক, নাট্যকার ও জীবনীকার হিসেবেও তার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

শাহাদাৎ হোসেন মাটির মায়ায় কোলকাতাতেই জীবন কাটিয়ে গেলেন। কি জুটেছিলো সেই শাহাদাৎ হোসেনের ভাগ্যে ? তাঁর জন্মশতবার্ষিকী গেলো ১৯৯৪ সালে। কোলকাতার প্রথম সারির কোনো পত্রিকাই তাঁর একটা ছবি ছাপেনি, দু'ছত্র সংবাদ ছাপেনি। অথচ তৃতীয় শ্রেণীর কোনো হিন্দু সাহিত্যিক মারা গেলেও ফলাও করে শোক প্রচার করা হয় পত্রিকায়। আবু রিদার "তসলিমা নাসরীন: জীবনবোধ ও যৌনচেতনা" গ্রন্থ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি:

এই রকম প্রতিভাধর যে সাহিত্যিক এ বাংলার মাটিতেই জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, এই মাটিতেই যিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন, এ বাংলার মাটির অন্তরেই যিনি কবরস্থ হয়েছেন, সর্বোপরি আজীবন যিনি এ-বাংলার কোলে বসেই বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন তার জন্মশতবার্ষিকীতে সংবাদ মাধ্যমগুলো সম্পূর্ণ নির্বিকার। তসলিমাকে বিংশ শতাব্দীর মুক্তিদাত্রী বানানোর পত্রিকাগুলো তাঁর সম্পর্কে কেন একটি হরফ লিখলেন না ?

উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক কাজী আব্দুল ওদুদ রবীন্দ্রনাথেরও গুণগ্রাহী ছিলেন। হিন্দুদের বিরুদ্ধে কখনো একটা কথা বলেননি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, *"গ্যেটের সমন্ধে তিনি যে বড় বইখানা লিখিয়া গিয়াছেন ভারতীয় সাহিত্যে তাহার তুলনা হয় না। এই একখানি মাত্র বইয়ের মাধ্যমেই আমরা ওদুদ সাহেবের চিন্তা ও মননের প্রসার ও গভীরতায়, তাহার দৃষ্টিভঙ্গির ও সর্বগ্রাহিতার এবং বিশ্বসংস্কৃতি সম্পর্কে তাহার সর্বন্ধরতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ*

www.pathagar.com

----তাঁহার মতামত ও বিচারের যৌক্তিকতা, এবং তাহার ন্যসাধারণতা, উদারতা, আমাকে প্রীত-বিস্মিত করিয়াছিলো।"

ত্যাঙ্গনে সেই আব্দুল ওদুদের পরিণতিটা জানানোর জন্য অন্নদাশঙ্কর [illegible] লেখা থেকে একটি অংশ(পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত) তুলে ধরছি:

যাবার (মৃত্যুর) আগে বইগুলো পুন:প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। যতদূর জানি, টাকাও কিছু আগাম দিয়েছিলেন। বই এখনো ছাপা হয়নি। হবার সম্ভাবনা দেখছিনে। বাজারে কোনো বই নেই। অথচ অন্তত: একখানি গ্রন্থের প্রচুর চাহিদা আছে। 'কবিগুরু গ্যেটে'। ----------

ইচ্ছা করলেই তিনি পাকিস্তানে গিয়ে আরো উন্নতি করতে পারতেন ও সাহিত্যের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেতে পারতেন। ভারতে তাঁকে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার বা রবীন্দ্র পুরস্কার দেয়া হয়নি। একহাজার টাকার শিশির কুমার পুরস্কার দেয়া হয় অন্তিম কালে। তার খানিকটা তিনি খয়রাত করেন ও বাকীটা তাঁর মৃতদেহ সৎকারের কাজে লাগে। তিনি যে এতদূর নি:স্ব এটা আমরা একদিন আগেও জানতুম না।

কেন আব্দুল ওদুদ আজ অবহেলিত? তিনি মুসলমান ছিলেন বলে? একই অবস্থা গোলাম মোস্তাফা, রবীন্দ্রভক্ত সৈয়দ মুজতবা আলী, হুমায়ুন কবীর, শাহাদাৎ হোসেন, এস. ওয়াজেদ আলীসহ সব মুসলমান সাহিত্যিকদের। এদের কারো বই কলকাতায় সহজে কিনতে পাওয়া যায় না।

নজরুল, নিজের জীবনে হিন্দুও ছিলেন না মুসলমানও ছিলেন না, ছিলেন খাঁটি বাঙালী, হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রতীক। তাঁকে কোথায় ঠেলে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের 'অসাম্প্রদায়িক' হিন্দু সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা? কোলকাতার সাপ্তাহিক "নতুন গতি"র একটি সম্পাদকীয়'র কিয়দংশ উল্লেখ করা যাক :

প্রায় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কবি নজরুলের জন্ম দিনে জাতীয়তাবাদী দৈনিক কাগজগুলি তাঁর উপর শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপেনি। কোনো কোনো পত্রিকায় কোথাও কোথাও নজরুল জয়ন্তী হওয়ার সংবাদ ছাপা হয়েছে। কিন্তু কোনো পত্রিকা নজরুলের ছবি ছাপেনি সেই সংবাদের সাথে। এ এক অদ্ভুত অবহেলা। আকছার কাগজগুলি চিঠিপত্র কলামে চিঠিপত্রের ওপর বিরাট বিরাট ছবি ছাপে সেই

www.pathagar.com

বিষয়ের উপরে। কিন্তু নজরুলের ক্ষেত্রে কোনো জায়গা মেলেনি। এ যে দারুণ পক্ষপাতিত্ব সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেবল "গণশক্তি" পত্রিকা 'আজকের দিনটি' শিরোনামের মাথায় ছোট্ট একটি ছবি ছেপেছিলো। অথচ কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন সত্যিকারের হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত। আজ এই কলহের দিনে নজরুলের কথাই তো বেশি করে আলেচিত হবার কথা। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে তিনি মুসলিম বলেই কি তাঁর প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব ?

লেখক এর পরেই উল্লেখ করেছেন: *অথচ জ্যৈষ্ঠ মাসের ঐ দিনগুলোতে এবং তার অব্যবহিত আগে পরে ঐসব পত্রিকায় তসলিমাকে নিয়ে একাধিক আলোচনা হয়েছে। নিবন্ধ ছাপা হয়েছে।*

এসব কারণে উনিশ শতকের শেষ দিকেই মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতনতা দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের আচরণের প্রতিক্রিয়ায় এঁদের একাংশের প্রচেষ্টায় কোলকাতাতেই গড়ে উঠে দু'একটি মুসলিম সংগঠন। দেশ বিভাগের পর "পূর্ব-পাকিস্তান রেঁনেসা সোসাইটি" ও "পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ" সংঘটিত হয় ঢাকায়। উনিশ শতকে গোঁড়া হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে যে সব ইসলাম-প্রভাবিত উপাদান ও বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতির উপাদান বাদ দিয়েছিলেন, তা পুনরুজ্জীবিত করার অঙ্গীকার করেন রেঁনেসার সংগঠকরা। এদের মধ্যে আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবু জাফর শামসুদ্দীন, জহুর হোসেন চৌধুরী, ফররুখ আহমেদ, সৈয়দ নুরুদ্দীন, খায়রুল কবীর, সৈয়দ আলী আহসানের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের অনেকেই, কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় এঁদের চাপেই পাকিস্তান সরকার দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে কমিটির হাতে প্রভূত ক্ষমতা দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে পুলিশ এই কমিটিকে সর্বাত্মক সহায়তা করে। কমিটি থেকে বিভিন্ন স্কোয়াড বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে ত্বরিৎ গতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার ও আরো অনেকের সঙ্গে আমি নিজেও সেই কমিটিতে ছিলাম। সে কমিটির কার্যকলাপের অনেক সাক্ষী এখনো জীবিত আছেন। প্রশ্ন হচ্ছে যারা মুখে ও কর্মে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তারা কেন বাঙালি মুসলমানদের

www.pathagar.com

জন্য আলাদা সংগঠন করতে গিয়েছিলেন। অনেক উৎস থেকে তার জবাব পাওয়া যাবে। এখানে রবিশঙ্করের "রাগ অনুরাগ" গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ আমি উদ্ধৃত করবো। এ গ্রন্থে তাঁর যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে বোঝা যাবে কেন মুসলমানরা নিজেদেরকে আলাদা জাত বলে ভাবতে বাধ্য হয়েছিলো।

পন্ডিত রবিশঙ্কর, দুনিয়াব্যাপী নাম তাঁর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমেরিকায় সেতার বাজিয়ে পয়সা তুলেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশে এসেছিলেন, বিরাট অভ্যর্থনা পেয়েছেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর শিষ্য ছিলেন তিনি। আমরা শুনেছি, অন্তত এই একটা ব্যাপারে অর্থাৎ গুরু-শিষ্য সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নাক গলাতে পারে না। রবিশঙ্করের নিজের লেখা বই "রাগ অনুরাগ" থেকে কিছু উদ্ধৃতি নিয়ে বিষয়টি আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। রবিশঙ্কর লিখেছেন:

"আমি যখন থেকে, এই ধর ১৯৩৯-৪০ সাল থেকে, গান বাজনার লাইনে নামলাম তখনই দেখলাম যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে—এক কাশী, বিহার ও মহারাষ্ট্র অঞ্চল বাদ দিয়ে—একেবারে মুসলমান শিল্পীদের প্রাধান্য। তাঁদের এবং তাঁদের ভক্তবর্গকে নিয়ে এমন একটা জোট ছিলো চারিদিকে যে, তার মধ্য দিয়ে গলে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো খুব মুশকিলের ব্যাপার ছিলো কোনও হিন্দু শিল্পীর পক্ষে। - - - -

আর একটা জিনিস বিশেষ লক্ষ্যনীয়। শুধু গাইয়ে-বাজিয়েরাই নয়, মুসলমান মাত্রকেই দেখবে তারা অদ্ভুত সুন্দর কথা বলতে পারে। - - - - - - - গাইয়ে বাজিয়েদের ভেতর তো বিশেষ করে এটা দেখা যায়। একটা বন্দিশ বা তান অথবা ফিরৎ শোনাবার সময় সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলে, এই বন্দিশ কত পুরনো, এই ফিরৎ দেখুন, এই তান দেখুন, কি মুশকিল তান (সঙ্গে ঢিমা লয়ে সেটারই সরাগম করে দেখাবে)! এইসব বলে শ্রোতাকে এমন কন্‌ভিন্‌স্‌ড্‌ করে দেয়! এদের গান বাজনার সঙ্গে সঙ্গে এই সেল্‌ম্যান্‌শিপ্‌টাও খুব আছে।"[১]

উল্লেখ্য যে রবি শঙ্কর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ গোলাম আলী, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ আমীর খাঁ ওস্তাদ বেলায়েত খাঁ প্রমুখের প্রসঙ্গে উপরের

১। রবি শঙ্কর, *রাগ অনুরাগ*, পৃ ১১৪-১২০।

www.pathagar.com

কথাগুলো বলেছেন। কাজেই 'এই সেল্‌স্‌ম্যানশিপ্‌টা'র কারণে যারা বড় ওস্তাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন বলে রবিশঙ্কর মনে করেন তাঁদের মধ্যে তাঁর ওস্তাদ ও ধর্মবাপ আলাউদ্দিন খাঁও পড়েন। অথচ রবিশঙ্করের মতো অতো ভালো করে আর কে জানে যে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, আলী আকবর খাঁ, বেলায়েত খাঁ প্রমুখের মধ্যে 'সেলস্‌ম্যানশিপটা'র বিন্দু বিসর্গও ছিলো না। রবিশঙ্করের বইটিতেও তার ইঙ্গিত আছে। তবে রবিশঙ্কর ও তার ভাই উদয় শঙ্করের মধ্যে 'এই সেলস্‌ম্যানশিপটা' ভালই ছিলো এবং তা ছিলো বলেই উদয় শঙ্করই প্রথমবারের মতো আলাউদ্দিন খাঁ-কে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে পশ্চিমাজগতে তাঁকে পরিচিত করিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

রবিশঙ্কর প্রথম ইউরোপ গিয়েছিলেন তাঁর ভাই উদয় শঙ্করের সহযোগী নর্তক হিসেবে। এরপর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে ইউরোপে নিয়ে যান তারা। জাহাজঘাটে তাঁর মা বিদায় জানাতে এসছেন তাঁদেরকে। সে ঘটনার স্মৃতি চারণ করছেন রবিশঙ্কর :

বাবার (ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ) হাতটা ধরে আমার হাতটা তার মধ্যে দিয়ে মা বললেন, দেখবেন এই ছেলেটাকে আমার। ওর বাবা এই কিছুদিন হলো মারা গেছে। আজ থেকে আপনিই ওর বাবা। ভুলত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন। আপনার হাতেই ওকে ছেড়ে দিলাম। আর কোথায় যায়! মাতো সেই কাঁদছেনই, বাবাও সেই দেখে যে কি কাঁদতে শুরু করলেন তখন! বললেন, মা আপনি দেবী, আপনি রত্নগর্ভা, আমি তো ম্লেচ্ছ![১]

আলাউদ্দিন খাঁ কেন নিজেকে ম্লেচ্ছ বলেছিলেন! গালটা তো মৌলবাদী হিন্দুদের দেয়া! সেই গাল তিনি নিজেকেই দিলেন? নাকি কথাটা রবিশঙ্করের বানানো? আর যদি আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তা বলেও থাকেন তাহলেও আন্দাজ করা যায় নিজের মুখে এ গালটা উচ্চারণ করতে যতটা কষ্ট হয়েছিলো তাঁর, নিশ্চয়ই তার চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট ছিলো মনের মধ্যে, হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক আচার আচরণের কারণে। হয়তো সে জন্যই, প্রসঙ্গ পেয়ে, রবিশঙ্করের মাকে খোঁচাটা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার, রবিশঙ্কর তার ওস্তাদ ও ধর্ম-বাপের কথাটা (আমরা জানি না সত্যি কিনা) ৫০

১। রবিশঙ্কর, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৩।

www.pathagar.com

বছর পর উল্লেখ করে বোঝাতে চাইলেন যে আলাউদ্দিন খাঁর মত লোকও নিজেকে হিন্দুদের তুলনায় ছোটই ভাবতেন, ম্লেচ্ছই ভাবতেন। অন্যত্র রবিশঙ্কর মানুষের মনের ওপর সঙ্গীতের প্রভাবের কথা আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন *: একেবারে জড় বা আওরংজেব যদি না হয় তাহলে সাধারণ মানুষ মাত্রেরই দূরে বাজছে মেঠো বাঁশি বা সানাই বা কেউ ভাটিয়ালির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে যাচ্ছে শুনে তো সেটা ভাল লাগবেই।'* ভেবে দেখার বিষয় যে রবিশঙ্করের মতো লোক 'আওরংজেব' নামটিকে নিষ্প্রাণ জড়ের সমার্থক শব্দ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন।

এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশের 'অসাম্প্রদায়িকতার' আসল রূপ। রবিশঙ্করের মতো গুণী ব্যাক্তি যদি এসব কথা বলতে পারেন তাহলে দুই বাংলার মিলনের প্রশ্নে প্রথমেই একটা হতাশা এসে দমিয়ে দেয় বৈ কি!

কিন্তু বার বার একই প্রশ্ন আমার মনে জাগে যে, পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের দিকে তাকাচ্ছেন না কেন। ওখানে সব জায়গায় ভারতের অন্যান্য জাতির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ব্যবসা, ইলেকট্রিসিটি, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট সর্বত্র মাড়োয়ারীদের দাপট। এসব হয়েছে জ্যোতি বাবুর আমলেই। ভারতে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয়ভাবে বাঙালির বিশেষ কোনো অবস্থান নেই। কোনো বাঙালি ভারতের জাতীয় কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী বা শিল্পপতির আসন পায়নি। কোনো আন্তর্জাতিক ফোরামে বাঙালি পরিচয়ে কোনো বাঙালি শিল্পী সাহিত্যিক রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা সাহিত্য বা সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করতে পারে না। হিন্দীর চাপে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার পরিসর ছোটো হয়ে আসছে। স্টেশনে, রেস্টুরেন্টে, হাটবাজারে গেলেই শোনা যাবে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত হিন্দী মিশ্রিত এক অদ্ভুত জগাখিচুরি বাংলায় কথা বলছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত ভালো বাংলা বইয়েরও কদর নেই ওখানে, তাই তাদের মূল বাজার বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গের কবি সাহিত্যিকরা এখানে এসেই যা একটু রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পায়। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বাংলাদেশেই বেঁচে আছে। পশ্চিমবঙ্গ তো সবদিক থেকে হিন্দীর গ্রাসে। সিনেমা, নাটক, গানে—সর্বত্র

১। রবিশঙ্কর, পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৩।

www.pathagar.com

হিন্দীর দাপট। ও দেশে মরতে বসেছে বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতির খাঁটি রূপ। আমাদের পর্যন্ত দু:খ হয় যে, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি, আমাদের বাংলা আবহ দিন দিন ছোটো হয়ে আসছে, হোক না সে পশ্চিমবঙ্গের বিষয়। অথচ ওখানকার বহু বুদ্ধিজীবী বাঙালি মুসলমানের সমালোচনা করে করে দিব্যি আনন্দে বগল বাজিয়ে চলেছেন।

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এখন যতটা ঘোলা হয়ে উঠেছে পাকিস্তান আমলেও ততটা ছিলো না। বলা হতো পাকিস্তান আমলে সরকার ছিলো সাম্প্রদায়িক। কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজের সৎ ও সচেতন অংশ বিশেষ করে রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা দুই জাতির সুসম্পর্ক নষ্ট হতে দেননি। হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ওপর পরিচালিত সমস্ত হামলা তারা প্রতিরোধ করেছেন। পাকিস্তান আমলের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি যে আজ সৃষ্টি হয়েছে তার একটা বড় কারণ পশ্চিমবঙ্গের এবং ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক আচরন। ভারতের সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা নির্লজ্জ আচার আচরণ দিন দিন বাড়িয়ে চলেছে বলেই তার প্রতিক্রিয়াও এখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবু তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। পশ্চিমবঙ্গের এই উপলব্ধি এখনো কেন আসছে না !

মৌলবাদী ও পাকিস্তানপন্থী বাংলাদেশীদের তৎপরতা

একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানপন্থীরা এখনো সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়নি। এ গ্রুপটি প্রকাশ্য কার্যকলাপে জড়ায় না বলে তাদের বিরুদ্ধে কিছু করারও নেই। কিন্তু গত বিশ বছরে মৌলবাদী শক্তির উত্থান অনেককে শঙ্কিত করে তুলেছিলো। এর পিছনে আমাদের তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ ভূমিকা আছে। তারা গত বিশ বছর ধরে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বিশাল হাঁকডাক দিয়ে আন্দোলনে নামেন, মাসকয়েক পরে পদ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোন্দল করে ঝিমিয়ে পড়েন। তারচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো 'বামপন্থীরা' মৌলবাদের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেন। এর ফলে সাধারণ মুসলমানের

www.pathagar.com

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে; তাদের আবেগ ধীরে ধীরে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যেতে থাকে। এভাবে মৌলবাদ-বিরোধী আন্দোলনকারীরা মৌলবাদের ভিতকেই শক্ত করেন।

প্রসঙ্গক্রমে গণ আদালতের কথা উল্লেখ করা যায়। বি এন পি'র আমলে তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যোগে সোহ্‌রোওয়ার্দী উদ্যানে গণ আদালত বসে ৭১ সালের ঘাতক-দালালদের বিচার করার জন্য। আওয়ামী লীগ তাতে পূর্ণ সমর্থন জানায়। গণ আদালতের বিচারকগণ গোলাম আজমের ফাঁসির 'আদেশ' প্রদান করেন। সে ফাঁসির 'আদেশ' কার্যকর করার জন্য আন্দোলনও হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি বা গণ আদালতের কেউ কিছু বলছেন না। এখন আওয়ামী লীগ চাইলেই গোলাম আজমের 'ফাঁসির আদেশ' কার্যকর করতে পারে। গণ আদালতের 'রায়' কার্যকর করার কথা না হয় বাদ দিলাম, আওয়ামী লীগ ইচ্ছে করলে প্রচলিত আইনে গোলাম আজমের বিচারের উদ্যোগ তো নিতে পারে। আওয়ামী লীগ তা করছে না, নির্মূল কমিটিও আর সে দাবীর প্রসঙ্গ তুলছে না। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য এসব চলছে। এ ধরনের কার্যকলাপেই 'বামপন্থী'দের অবস্থান নষ্ট হয়েছে। গণমত চলে গেছে তাদের বিপক্ষে। এমনকি ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামাতের মতো জঘণ্য একটি রাজনৈতিক দলের রাজাকার প্রার্থীদের মধ্যে ১৮ জন নির্বাচিত হতে সমর্থ হয়েছিলো। এটি ছিলো এদেশের অর্ধশিক্ষিত জনগণের একাংশের ভুল। অবশ্য বর্তমানে অবস্থা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এদেশের মানুষ যে মূলত সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী তার প্রমাণ তারা দিয়েছে। ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মৌলবাদী সবগুলো দল মিলে মাত্র ৪টি আসন পেয়েছে। সামাজিকভাবেও এদেরকে বয়কট করে রাখা হয়েছে।

কোনঠাসা হলেও মৌলবাদীরা গণতান্ত্রিক সুবিধা নিয়ে কিছু গোলমেলে কাজ করতে পারে, তার একটি উদাহরণ তসলিমা নাসরীনের ঘটনা। একইভাবে, ১৯৯০ ও '৯২ সালে ভারতের মুসলমানদের ওপর মৌলবাদী হিন্দুদের হামলা চলাকালে এখানকার মৌলবাদীরা ঘটনার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। তাদের

www.pathagar.com

পত্র পত্রিকায় উস্কানিমূলক বক্তব্য ছাপা হয়। বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চলে। যে সব স্থানে তাদের অবস্থান ভালো সেখানে, বিশেষত চট্রগ্রাম, নোয়াখালী ও সিলেটের কোনো কোনো এলাকায় ওরা হিন্দুদের মন্দির ও বাড়িঘর ভাঙ্গার চেষ্টা চালায়। পুরোনো ঢাকায় অর্ধশিক্ষিত মুসলমানরা বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার খবর শুনে হিন্দু মন্দিরে হামলা চালায়। বেশ কিছু হিন্দু পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু পরিস্থিতি বিপদজনক মোড় নেয়ার পূর্বেই সরকার এবং সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায় তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশীদের আন্দোলন এখনো অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি সচেতন মানুষের কাছে মৌলবাদী মুসলমানরা আজ একদল বিভ্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। সামাজিকভাবেও ওরা একঘরে।

কিন্তু ভারতে ঘটছে ঠিক উল্টো ব্যাপার। গত সাধারণ নির্বাচনে ভারতে মৌলবাদী হিন্দুরা সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে। অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য হলেও তারা সরকার গঠন করেছিলো। ভারতে হিন্দু মৌলবাদীদের গ্রুপটিই এখন সবচেয়ে শক্তিশালী।

হিন্দু মৌলবাদীদের প্রতিপত্তি দিন দিনই বাড়ছে। এখন ওরা প্রকাশ্যেই বলছে ভারত হিন্দু জনগণের রাষ্ট্র, অন্য ধর্মের লোকদের এখানে স্থান নেই। সাধারণ মানুষের ভোটেই নির্বাচিত হয়েছে ওরা। এদের বিজয় কি প্রমাণ করে না ভারত হিন্দু মৌলবাদীদের দখলে যাচ্ছে? এরপরও কেন পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে কল্পিত সাম্প্রদায়িকতার চিত্র তুলে ধরে এর সমালোচনাতেই বিভোর হয়ে আছেন ? এখন তাদের ঘর সামলানোর চেষ্টা করা উচিত।

ভারতে যদি হিন্দু মৌলবাদীদের উত্থান প্রতিরোধ না করা যায় তাহলে এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়বে। ভারতের উদাহরণ দিয়ে এদেশের মৌলবাদীরা দিনে দিনে তাদের আবেগ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। এভাবে চলতে থাকলে সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশেও, ভারতের মতোই, এক ভয়াবহ অবস্থায় পৌছুতে পারে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ১০.৫ শতাংশের মতো হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তাদের অনেকে বাংলাদেশকে নিজের দেশ মনে করেন না। কোনো বিষয়ে কথা বলতে গেলেই তারা ভারতের উদাহরণ টেনে বলবেন বাংলাদেশের এটা খারাপ, ভারতেরটা অনেক ভালো। এরা সত্যি সত্যি বাংলাদেশে বাস করেন, আর ভারতকে নিজের দেশ বলে ভাবেন। সঙ্গতিসম্পন্ন অনেক হিন্দু পরিবার ভারতে একটা ছেলেকে পাঠিয়ে অথবা একটা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে রাখতে চান। কেউ কেউ টাকা পয়সা জমান ভারতে। তারপর একসময় সপরিবারে সীমান্তের ওপারে চলে যান। এবং এই চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর 'অত্যাচারী' আখ্যাটা রেখে যান অমূলকভাবেই। এদের এ ধরণের আচরণের কোনো কারণ নেই। এঁরা এখানে যথেষ্ট টাকা পয়সা ও সম্মানের মালিক। তবু বাংলাদেশকে ছেড়ে যেতেই এদের আগ্রহ। মুসলিম-বিদ্বেষের কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া এসব হিন্দুদের দেশত্যাগের উদাহরণ টেনেই বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের হিন্দুরা মুসলমানদের নির্যাতনের মুখে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে, মুসলমানরা এদের ঘরবাড়ি জমিজমা বিনা পয়সাতেই রেখে দিচ্ছে। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে এক জমি দু'বার-তিনবার বিক্রি করে যাওয়া হয়েছে। মুসলমানদের অত্যাচারে জমি বাড়ি ফেলে রেখে ভারতে পড়ি জমানোর গল্প যে অধিকাংশ সময়েই বানিয়ে বলা হয় তা দুয়েকটি দেশত্যাগী পরিবারের পূর্বের ঠিকানায় তদন্ত করলেই বোঝা যাবে।

আমি দাবী করছি না যে, বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর কোনো অন্যায় অবিচার হচ্ছে না। সংখ্যালঘু হিসেবে বাংলাদেশের হিন্দুরাও নানান সমস্যায় ভোগে থাকেন। একশ্রেণীর মানুষই থাকে দুর্বলের ওপর অত্যাচার শোষন চালানোর জন্য। এদের কাছে ধর্মটা ততো বড়ো নয়। এরা হিন্দুর জমি নেয়, মুসলমানেরও জমি নেয়। তাদের বাড়িঘর ভাঙ্গে। এবং যেহেতু এদেশে আইন এখনো ১০০ ভাগ কার্যকর হয় না তাই এসব অন্যায়ও কখনো ১০০ ভাগ নির্মূল হয়নি। হিন্দুরা এদেশে সংখ্যালঘু। তাই তাদের ওপরই হামলাটা বেশি হয়। বাংলাদেশ ভারতসহ পৃথিবীর সব দেশের সংখ্যালঘুরাই এ সমস্যার

www.pathagar.com

মুখোমুখি। কিন্তু এ কথা সত্যি নয় যে, সরকার বা আইন তাদের সাহায্য করে না। বরং বাংলাদেশে হিন্দুদের ব্যাপারে প্রশাসন অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নেয়। কারণ বিষয়টি স্পর্শকাতর বলে তারা সতর্ক থাকে।

এরপরও কোথাও কোথাও হিন্দু পরিবার অত্যাচারিত হচ্ছে। সেখানে দুর্বল মুসলমানও নির্যাতিত হচ্ছে। আসলে শোষন-নির্যাতনের পুরোনো ধারাই অব্যাহত রয়ে গেছে। এখানে হিন্দু মুসলমান বড় কথা নয়, দুর্বল বা সবল হওয়াটাই প্রধান ব্যাপার। হিন্দুরা এদেশেরই মানুষ। এদেশের সামাজিক সমস্যাকে তারা এড়িয়ে যেতে পারেন না। যে সামাজিক শোষন অন্যায় যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, যার বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করছে হাজার হাজার বছর ধরে তার সাথে সাম্প্রদায়িকতাকে জড়ালে প্রতিরোধের শক্তিটা দূর্বল হয়ে যাবে। স্বার্থান্বেষী মানুষেরা তাই চায়।

যারা আবেগ বশে বলে থাকেন বাংলাদেশে হিন্দু মাত্রই অত্যাচারিত তারা একটু গভীরে অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবেন আসলে এ ধারণাটি একটি ভ্রান্ত অনুমান ও মিথ্যা প্রচারের ফল। তবে কিছু কিছু হিন্দু পরিবার দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন সে কথায় সত্যতা আছে। কিন্তু তারা যে মুসলমানদের অত্যাচারেই দেশ ছাড়ছেন এ কথা সত্যি নয়। তাদের দেশত্যাগের অন্য কারণ আছে।

কেন দেশ ছাড়েন হিন্দুরা ? মুসলমানদের অত্যাচারে নয়, এরা দেশ ছাড়েন এক কল্পিত ভারতের উদ্দেশে। তাদের ধারণা ওখানে গেলেই সকল উন্নতি হাতের মুঠোয় চলে আসবে, কেউ তাদের ওপর অন্যায় করতে পারবে না এবং সে দেশটিকে মুসলমানের দেশ বলে মনে হবে না। তাদের দেশ ছাড়ার পেছনে আরেকটি কারণ হলো এরা এখনো আগের অবস্থায় থাকতে চান। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা চান আগের মুসলমান প্রজাদের মতো এখনো মুসলমানরা হিন্দুদের দেখে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াক, হাত তুলে নমস্কার করুক, ধমক দিলে মাথা নিচু করে থাকুক। ভারত কেন, পৃথিবীর কোথাও যে তাদের এ সামন্তবাদী আশা পূর্ণ হওয়ার নয় সে কথাটি এরা বুঝতে চান না।

www.pathagar.com

অথচ ভারতে দেখেছি ওখানকার মুসলমানদের মধ্যে দেশপ্রেম আছে। ওরা দেশত্যাগের চিন্তা করে না। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পর সারা ভারতে বহু মুসলমান খুন হয়েছে, কিন্তু কেউ দেশ ছেড়ে যায়নি। কারণ ভারতকে তারা নিজেদের দেশ বলেই ভাবে।

বাংলাদেশী হিন্দুদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো। অনেক মেধাবী হিন্দু ছেলে মেয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে পড়াশোনা করে সেখান থেকে ভারতে চলে যায়। ব্যাবসায়ীদের মধ্যেও এ প্রবণতা দেখেছি। বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশী হিন্দুদের পরবাসী মনোভাবও ত্যাগ করা দরকার।

www.pathagar.com

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কি হবে তার নির্ণায়ক হচ্ছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে এ সত্যটি ভুলে যান অথবা এড়িয়ে যান। ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক তিক্ত হলে পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মধুর হওয়ার কোনো কারণ নেই। ভারতের যে কোনো সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জনগনকেও অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে, সেখানে ন্যায় অন্যায় বিচারের প্রশ্ন অবান্তর মনে করা হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বাইরে দুই অঞ্চলের জনগণের একটা অংশের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু শুধু তা দিয়ে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক সম্পর্ক বিচার করা অসম্ভব। এতে কখনো প্রকৃত পরিস্থিতি বোঝা যাবে না। এ কারণে আমরা বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সম্পর্ক বিচারের জন্য এর নিয়ামক হিসেবে ভারতের ভূমিকা যাচাই করে দেখবো।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার জন্য দেশটির প্রতি বাঙালি জাতির কৃতজ্ঞতা থাকাই স্বাভাবিক। আমাদের তা আছেও। কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমরা ভারতের ক্রমাগত অন্যায় কার্যকলাপ বরদাস্ত করে যাবো। এ প্রসঙ্গে সম্ভবত এ প্রশ্নটিও তোলা যায় যে, ভারত কেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা করেছিলো। সন্দেহ নেই, ভারত মূলত: তার আজন্ম-শত্রু মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দুর্বল

www.pathagar.com

করে দেয়া এবং ভবিষ্যতের ছোটো প্রতিবেশীর সুযোগ নেয়ার জন্যই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন করে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের তিরানব্বই হাজার আত্মসমর্পণকারী সৈন্যের শত শত কোটি টাকার অস্ত্রের কোনো হিসেব বাংলাদেশের সরকারকে দেয়া হয়নি। এরপর সীমান্ত চুক্তিকে কেন্দ্র করেও সন্দেহ দেখা দেয়। করিডোর বদলের চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সাথে সাথে বেরুবাড়ি ভারতের হাতে তুলে দিলেও ভারত জোরপূর্বক প্রায় দুই যুগ পর্যন্ত তিনবিঘা করিডোর তার দখলে রাখে। (রাজশাহী, দিনাজপুর, ফেনী প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলাদেশের টুকরো টুকরো ভূখন্ড এখনো ভারতের দখলে)। এসব ঘটনার ফলে তখন থেকেই ভারত সমর্থক, উদারপন্থী বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ভারতের প্রতি সন্দেহ দেখা দেয়।

১৯৭৫ পর্যন্ত ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিলা অনেকটা ধামাচাপা গোছের। আওয়ামী লীগের অর্থহীন এবং মাত্রাতিরিক্ত ভারতমুখীতার কারনে দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক বাস্তবতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানের সুবাদে আওয়ামী লীগের দাবীও অনেক বেড়ে যায়। তারা মনে করতে থাকে তাদের সিদ্ধান্তই সমগ্র দেশের সিদ্ধান্ত। এ কারনে আওয়ামী লীগ তার দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নির্ধারিত করে। এটি ছিলো আওয়ামী লীগের জন্য এক মারাত্মক ভুল যার মাশুল দিতে হয়েছে আরো বিশ বছর। কারণ বিরোধী দলগুলো আওয়ামী লীগকে ভারতের দালাল বলে প্রচার করে দীর্ঘদিন এ দলটিকে কোণঠাসা করে রাখতে পেরেছিলো। অথচ জিয়াউর রহমান এরশাদ এদের সবার সাথেই ভারতের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিলো।

আশির দশকে ভারত আন্তর্জাতিক নদীসমূহের প্রবাহ সম্পর্কিত নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এবং এদেশের মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা না করেই গঙ্গার প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গ মরুভূমিতে পরিণত হয়। ভারত কর্তৃক তালপট্টি দখল ছিলো বিরোধের আরেকটি উপাদান। এর বাইরেও অনেক দ্বিপাক্ষিক সমস্যা রয়ে গেছে। বাংলাদেশের অনেকেই মনে করে চট্রগ্রামের বিপথগামী উপজাতীয় সংগঠন শান্তি বাহিনীর অস্ত্র, খাদ্য ও

www.pathagar.com

আশ্রয়ের উৎস সীমান্তের ওপারে। নরসীমা রাওয়ের আমলে অবসরপ্রাপ্ত সাবেক ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব জে. এন. দীক্ষিতও স্বীকার করেছেন যে এ অভিযোগে সত্যতা আছে।[১] দৈনিক পত্রিকা খুললে দেখা যায় সীমান্তে প্রায়ই বি.এস.এফ-এর হাতে নীরিহ বাঙালি মারা পড়ছে। এর সাথে যুক্ত হয় মৌলবাদীদের প্রোপাগান্ডা। এসব কারণে দেশব্যাপী ভারত-বিরোধিতা বাড়তেই থাকে। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আওয়ামী লীগ।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পর ভারত তড়িঘড়ি যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো দূরদৃষ্টিপ্রসূত নয়। ভবিষ্যতে এগুলো নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশেষত, পানি চুক্তি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিপক্ষে যাবে বলেই মনে হয়।

১৯৯৬ সালের পানি চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশ তাদের উভয়ের ভৌগলিক সীমানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রসহ সবগুলো আন্তর্জাতিক নদীর পানি ভাগাভাগি করে নেয়ার অঙ্গীকার করেছে। গঙ্গার পানি প্রতিটি বাংলাদেশীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় ইস্যু। কারণ গঙ্গা অর্থাৎ পদ্মার পানির ওপর বাংলাদেশের ৩৭% জমির কৃষি এবং সাড়ে তিনকোটি মানুষ নির্ভরশীল। কাজেই কিভাবে এ সমস্যা শুরু হয় তা আগে জেনে নেয়া দরকার।

আন্তর্জাতিক প্রথানুযায়ী কোনো নদী একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে তা আন্তর্জাতিক নদী বলে গণ্য হবে। সে নদীর শাখা উপশাখা কোনো দেশে যতটুকু পানি প্রবাহিত করে ততটুকু পানিই সে দেশ ব্যবহার করতে পারবে। বাঁধ দিয়ে বা কৃত্রিম নদী কেটে কোনো আন্তর্জাতিক নদীর পানি সরিয়ে নেয়ার নিয়ম নেই। ভারত সে নিয়ম মানেনি। ১৯৪৭ সালের পর থেকেই সে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের শুষ্ক অঞ্চলে কৃষিব্যবস্থা চালু রাখার জন্য কৃত্রিম উপায়ে গঙ্গার প্রচুর পানি প্রত্যাহার করে নিতে থাকে। এর ফলে গঙ্গার নিম্নভাগে পানি প্রবাহ কমতে থাকে এবং তার অন্যতম শাখা, কলকাতার পাশ দিয়ে প্রবাহিত ভাগিরথী-হুগলি নদীতে পানি হ্রাস পায়। সঙ্কট দেখা দেয় কলকাতা বন্দরে। একই ভাবে পদ্মার পানিও কমতে থাকে। এ অবস্থায় ভারত ১৯৫১ সালে

১। জে.এন. দীক্ষিত, *ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েন,* ভোরের কাগজ, জুলাই ১৫, '৯৭।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে শুষ্ক মওসুমে গঙ্গার পানি আটকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সীমানার ১১ মাইল উজানে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা নামক স্থানে পদ্মা নদীতে বাঁধ দেয়ার পরিকল্পনা হাতে নেয়।[১] ১৯৭৪ সালে ফিডার ক্যানেলসহ বাঁধের কাজ শেষ হওয়ার আগে ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হলেও গঙ্গার পানি বন্টনের বিষয়টি কমিশনের এখতিয়ারের বাইরে রাখা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এক আনুষ্ঠানিক ঘোষনাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সে ঘোষনার ১৮ সংখ্যক অনুচ্ছদে উল্লেখ করা হয়, "এটা স্থিরিকৃত হয় যে দুই সরকার কর্তৃক গৃহীত কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকর করার জন্য কয়েক বছর প্রয়োজন। উক্ত সময়ের মধ্যে দুই পক্ষ এই ব্যাপারে দৃঢ়মত পোষণ করে যে, ফারাক্কা ব্যারেজ চালু হওয়ার আগেই দুই পক্ষ গঙ্গার শুষ্ক মওসুমের পানি বন্টনের ব্যাপারে পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানে উপনীত হবে।" কিন্তু এরপর ভারত বাংলাদেশের সাথে কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধানে না পৌঁছেই ফারাক্কা ব্যারেজ চালু করে দেয়। ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের সীমানায় গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির চেষ্টা করার উল্লেখ থাকলেও কোথাও বলা হয়নি যে উত্তর প্রদেশ ও বিহারে ব্যবহার্য পানির পরিমান ধার্য্য করে দিয়ে পদ্মার পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা হবে। ভারত বরং প্রস্তাব রাখে যে, নেপালে জলাধার নির্মাণ করে অথবা ব্রহ্মপুত্র থেকে খাল কেটে এনে গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা হোক। অর্থাৎ ভারত গঙ্গার পানির সিংহভাগ নিজে নেয়ার বন্দোবস্ত তো করেই সেই সাথে ব্রহ্মপুত্রের পানি টেনে নেয়ার জন্যও সুযোগ খুঁজতে থাকে।

১৯৭৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে বাঁধ চালু করার আগে তাৎক্ষণিক চুক্তিতে ভারত স্বীকার করে নিয়েছিলো যে, স্থায়ী চুক্তিতে উপনীত না হয়ে ভারত বাঁধ চালু করবে না। কিন্তু বাংলাদেশ স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছার আগেই ভারতকে ৪১ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বাঁধ চালু করার অনুমতি দিয়ে দেয়। সুযোগ পেয়ে ভারত ৪১ দিনের পরও বাঁধের মাধ্যমে পানি টেনে নিতে থাকে।

১। পানিচুক্তি ও ট্রানজিট সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য খালেকুজ্জামানের *"ট্রানজিট - হাইওয়ে বিতর্ক, পানিচুক্তি ও বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক"* নামক পুস্তিকা এবং দেশী বিদেশী পত্র-পত্রিকা থেকে নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সারণী-১

১৯৭৫ সালের পানি বন্টন চুক্তি

কিউসেকে

সময়	ভারতের অংশ	মোট প্রবাহের শতকরা হার	বাংলাদেশের অংশ	মোট প্রবাহের শতকরা হার
২১-৩০ এপ্রিল	১১,০০০	২০%	৪৪,০০০	৮০%
১-১০ মে	১২,০০০	২১%	৪৪,৫০০	৭৯%
১১-২০ মে	১৫,০০০	২৫%	৪৪,২৫০	৭৫%
২১-৩০ মে	১৬,০০০	২৪%	৪৯,৫০০	৭৬%

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে সম্পাদিত এই অস্থায়ী চুক্তিতে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পানি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলো। এরপর থেকে বাংলাদেশের হিস্যার পরিমাণ কেবল কমে আসছে।

www.pathagar.com

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাওলানা ভাসানীর আন্দোলন, লংমার্চ এবং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপ ইত্যাদির ফলে ভারত ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের সাথে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। সে চুক্তিতে ভারত ও বাংলাদেশ সারনী ২-এ বর্ণিত বন্টন ব্যবস্থা অনুযায়ী গঙ্গার পানি ভাগাভাগি করে নেবে বলে অঙ্গীকার করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী ফারাক্কা পয়েন্টে গঙ্গার পানি ব্যাপকভাবে কমে গেলেও বাংলাদেশ তার পাওনার ৮০% ভাগ পানি পেতে থাকবে। এটিই গ্যারান্টি ক্লজ। প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে আবার চুক্তিতে উল্লেখিত পানি পাবে বংলাদেশ।

'৭৭ সালের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারতের একগুঁয়েমীর জন্য আর কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮২ ও ৮৫ সালে এরশাদের সময় দু'টো সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সেগুলোতে ১৯৭৭ সালের চুক্তির বন্টন ব্যবস্থা বহাল রাখা হলেও গ্যার‍্যান্টি ক্লজ বাদ দেয়া হয়। গ্যার‍্যান্টি ক্লজ বাদ দেয়ার অর্থ হলো বাংলাদেশ কখনো চুক্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ পানি পাবে না। কারণ চুক্তিতে ফারাক্কা পয়েন্টে প্রবাহিত পানির পরিমাণ প্রকৃত প্রবাহের চেয়ে অনেক বেশি দেখানো হয়। গ্যার‍্যান্টি ক্লজ না থাকলে এবং পানির প্রবাহ কমে গেলে তার দায় ভারতকে নিতে হবে না বলে ভারত পানির প্রবাহ বাড়ানোর চেষ্টা করেনি। বরং গঙ্গার বেশিরভাগ পানি কিভাবে বিহার ও উত্তর প্রদেশে খরচ করে ফেলা যায় তার চেষ্টাই করেছে।

এরশাদের সময়ের সমঝোতা চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ বাদ দিতে সক্ষম হয় ভারত। কারণ এরশাদের পক্ষে কোনো জনমত ছিলো না। সামরিক বাহিনী ও পুলিশের সহযোগিতায় তিনি ক্ষমতায় টিকেছিলেন। এরশাদের এ দুর্বলতাটুকু কাজে লাগিয়ে ভারত চাপের মুখে তাকে বাংলাদেশের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিতে বাধ্য করে। ভারত এভাবে অতীতেও বাংলাদেশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে।

এ যাবত সবগুলো চুক্তিতে নদীর প্রবাহ বাড়ানোর জন্য দু'পক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টার উল্লেখ থাকলেও ভারত তার উল্টোটাই করেছে। ফারাক্কা পয়েন্টে গঙ্গার পানি দিন দিন কমে আসছে। গত পাঁচ বছরের হিসেবেই চুক্তিতে উল্লেখিত পানির প্রবাহ আর প্রকৃত প্রবাহের পার্থক্য কতটা বেড়েছে তা আন্দাজ করা যাবে ৩ নম্বর সারণি থেকে।

www.pathagar.com

সারণী-২

১৯৭৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী গঙ্গার পানি বন্টন ব্যবস্থা

কিউসেকে

সময়	ফারাক্কায় পানি প্রবাহ (১৯৪৮-৭৩ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা তথ্যের ৭৫ শতাংশ নির্ভর যোগ্য ধরে)	ভারতের প্রাপ্য পানির পরিমান	বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির পরিমাণ
জানুয়ারী			
১-১০	৯৮,৫০০	৪০,০০০	৫৮,৫০০০
১১-২০	৮৯,৭৫০	৩৮,৫০০	৫১,২৫০
২১-৩১	৮২,৫০০	৩৫,০০০	৪৭,৫০০
ফেব্রুয়ারী			
১-১০	৭৯,২৫০	৩৩,০০০	৪৬,২৫০
১১-২০	৭৪,০০০	৩১,৫০০	৪২,৫০০
২১-২৮	৭০,০০০	৩০,৭৫০	৩৯,২৫০
মার্চ			
১-১০	৬৫,২৫০	২৬,৭৫০	৩৮,৫০০
১১-২০	৬৩,৫০০	২৫,৫০০	৩৮,০০০
২১-৩১	৬১,০০০	২৫,০০০	৩৬,০০০
এপ্রিল			
১-১০	৫৯,০০	২৪,০০০	৩৫,০০০
১১-২০	৫৫,৫০০	২০,৭৫০	৩৪,৭৫০
২১-৩০	৫৫,০০০	২০,৫০০	৩৪,৫০০
মে			
১-১০	৫৬,৫০০	২১,৫০০	৩৫,০০০
১১-২০	৫৯,২৫০	২৪,০০০	৩৫,২৫০
২১-৩১	৬৫,৫০০	২৬,৭৫০	৩৮,৭৫০

www.pathagar.com

সারণী-৩

ফারাক্কার পানির প্রাপ্যতা

(কিউসেকে)

❑ চুক্তিতে উল্লেখিত

❑ প্রকৃত গড় (গত ৫ বছরের)

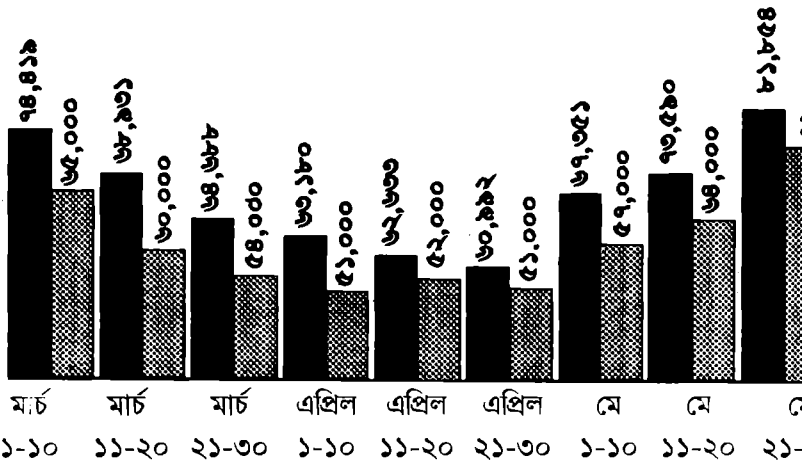

সূত্র : ইন্ডিয়া ডুডে-জানুয়ারী ১৫, ১৯৯৭

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশ গঙ্গার পানি ভাগাভাগি করে নেয়ার যে চুক্তি করেছে তাতে দেখা যায় বাংলাদেশের স্বার্থ আরেক দফা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আসলে ভারত সেই ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশকে নানা চাপের মুখে ফেলে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি চুক্তিতে ও সমঝোতায় বেশি করে সুবিধা নিচ্ছে। গঙ্গার পানি বন্টনের প্রতিটি নতুন চুক্তিতে ভারতের অংশ বাড়ছে, বাংলাদেশের পাওনা কমছে।

১৯৯৬ সালে ভারত আওয়ামী লীগের সাথে সুসম্পর্কের সুযোগ নিয়ে এক অসম ও অন্যায্য চুক্তি করতে সমর্থ হয়েছে। আওয়ামী লীগ মুখে বলছে বটে যে ১৯৯৬ সালের চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পানি পাবে, কিন্তু ১৯৭৫ ও ৭৭ সালের চুক্তির সাথে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় আওয়ামী লীগের দাবী সঠিক নয়। চুক্তিটি নানা ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের উপর দাড়িয়ে। তাছাড়া, এ চুক্তিতে ভারত তার স্বার্থানুযায়ী কিছু বাড়তি শর্তও জুড়ে দিয়েছে। এখানে সেগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত: এ চুক্তিতে ফারাক্কা পয়েন্টে পানির প্রাপ্যতা সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে। তিন নম্বর সারনীটিতে ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে বর্ণিত পানির প্রাপ্যতা এবং একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জরীপ অনুযায়ী বর্তমান সময়ে ফারাক্কায় পানির প্রকৃত প্রাপ্যতার তুলনা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে পানির প্রবাহ প্রকৃত প্রবাহের চাইতে তো বেশি দেখানো হয়েছেই, এমনকি ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে উল্লেখিত পানির পরিমানের চেয়েও তা ঢের বেশি।

চুক্তির বর্ণনা অনুযায়ী মার্চ ১-১০, ১১-২০ সময়পর্যায়ে যথাক্রমে ৭৪,৪১৯ ও ৬৮,৯৩১ কিউসেক পানি প্রবাহিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে। সেক্ষেত্রে ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে উপরোক্ত সময়ে ফারাক্কায় পানির প্রবাহ দেখানো হয়েছে যথাক্রমে যথাক্রমে ৬৫২৫০, ৬৩৫০০ কিউসেক। অথচ আমরা দেখছি বিহারে ও উত্তর প্রদেশে ক্রমবর্ধমান হারে পানি প্রত্যাহার করে নেয়ার কারণে ফারাক্কায় প্রবাহ দিন দিন কমছে। তা সত্যি

www.pathagar.com

সারণী-৪

১৯৯৬ সালের পানি চুক্তি

১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বন্টনের হার

(কিউসেকে)

সময়	ফারাক্কায় পানির গড় প্রবাহ (১৯৪৯-৮৮ পর্যন্ত)	ভারতের প্রাপ্য পানির পরিমান	বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির পরিমাণ
জানুয়ারী			
১-১০	১,০৭,৫১৬	৪০,০০০	৬৭,৫১৬
১১-২০	৯৭,৬৭৩	৪০,০০০	৫৭,৬৭৩
২১-৩১	৯০,১৫৪	৪০,০০০	৫০,১৫৪
ফেব্রুয়ারী			
১-১০	৮৬,৩২৩	৪০,০০০	৪৬,৩২৩
১১-২০	৮২,৮৩৯	৪০,০০০	৪২,৮৩৯
২১-২৮/২৯	৭৯,১০৬	৪০,০০০	৩৯,১০৬
মার্চ			
১-১০	৭৪,৪১৯	৩৯,৪১৯	৩৫,০০০
১১-২০	৬৮,৯৩১	৩৩,৯৩১*	৩৫,০০০
২১-৩১	৬৪,৬৮৮	৩৫,০০০	২৯,৬৮৮*
এপ্রিল			
১-১০	৬৩,১৮০	২৮,১৮০*	৩৫,০০০
১১-২০	৬২,৬৩৩	৩৫,০০০	২৭,৬৩৩*
২১-৩০	৬০,৯৯২	২৫,৯৯২*	৩৫,০০০
মে			
১-১০	৬৭,৩৫১	৩৫,০০০	৩২,৩৫১*
১১-২০	৭৩,৫৯০	৩৮,৫৯০	৩৫,০০০
২১-৩১	৮১,৮৫৪	৪০,০০০	৪১,৮৫৪

** ১লা মার্চ থেকে ১০ই মে পর্যন্ত প্রতি দশ দিন পর পর ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ই পর্যায়ক্রমে ৩৫,০০০ কিউসেক করে পানি পাবে।*

www.pathagar.com

হলে ১৯৯৬ সালের পানির প্রাপ্যতা ১৯৭৭ সালের তুলনায় কম হওয়ার কথা। অথচ ৯৬ সালের চুক্তিতে তা অনেক বেশি বলে দেখানো হয়েছে। আর প্রকৃত প্রবাহের সাথে তার ব্যবধানকে বিশালই বলা চলে।

ইন্ডিয়া টুডে-এর সূত্রানুযায়ী মার্চ ১-১০ ও ১১-২০ সময় পর্যায়ে ফারাক্কায় প্রকৃত পক্ষে যথাক্রমে ৬৫,০০০ ও ৬০,০০০ কিউসেক পানি প্রবাহিত হয়। ঐ পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : . . . . . water level has been steadily falling and there is not as much water for sharing as is projected in the treaty. "The calculations are based on poor arithmetic", says Debesh Mukerjee, a retired General Manager of Farakka Barrage. For instance, the treaty claims that between April 1 and 10, about 63,180 cusecs of water would be available at Farakka. But the average for the past five years has been just 51,000 cusecs.[১] [পানির প্রবাহমাত্রা স্থিরভাবে হ্রাস পা'চ্ছে এবং চুক্তিতে যে ভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে বন্টন করার মতো যথেষ্ট পানি আসলে এখানে (ফারাক্কা পয়েন্টে) নেই। ফারাক্কা বাঁধের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার দেবেশ মুখার্জী বলেন, "হিসেবটা কাঁচা অংকের ভিত্তিতে করা হয়েছে। যেমন, চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে এপ্রিল ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে ফারাক্কায় ৬৩,১৮০ কিউসেক পানি পাওয়া যাবে। কিন্তু গত পাঁচ বছরের গড় প্রবাহ ছিলো মাত্র ৫১,০০০ কিউসেক।] অতএব দেখা যাচ্ছে চুক্তির প্রথমেই রয়ে গেছে একটা বড় ফাঁকি।

দ্বিতীয়ত: সবচেয়ে শুষ্ক মওসুম ১লা মার্চ থেকে মে ১০ পর্যন্ত ১০ দিনের তিনটি পালাক্রমে উভয় পক্ষ ১০ দিন পর পর ৩৫,০০০ হাজার কিউসেক পানি পাবে বলে শর্ত জুড়ে দিয়েছে ভারত । এ শর্তানুযায়ী এপ্রিল ১ থেকে ১০ তারিখে বাংলাদেশ ৩৫,০০০ হাজার কিউসেক আর ভারত বাকী অংশ অর্থাৎ ২৮,০০০ কিউসেক পানি নেবে। আবার এপ্রিল ১১ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত ভারত ৩৫,০০০ এবং বাংলাদেশ ২৭,৬৩৩ কিউসেক পানি পাবে। এ

১। *INDIA TODAY*, Jan15, 1997.

www.pathagar.com

পালাক্রমের বিষয়টি, স্পষ্টত বাংলাদেশকে ঠকানোর আরেকটি অন্যায্য শর্ত। এর আগে কখনো এ ধরণের শর্ত ছিলো না। ১৯৭৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী এপ্রিল ১-১০ ও ১১-২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ পেতো যথাক্রমে ৩৫,০০০ ও ৩৪,৭৫০ কিউসেক এবং ভারত পেতো যথাক্রমে ২৪,০০০ ও ২০,৭৫০ কিউসেক। অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী এপ্রিল ১ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ পেতো মোট ৬৯,৭৫০ কিউসেক যা ছিলো মোট প্রবাহের প্রায় ৬১ শতাংশ। তখন ভারত পেতো মোট প্রবাহের প্রায় ৩৯ শতাংশ। বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী এ সময়পর্যায়ে বাংলাদেশ পাবে মোট ৬২,৬৩৩ কিউসেক যা মোট প্রবাহের ৫০ শতাংশেরও কম। ১লা মার্চ থেকে মে ১০ পর্যন্ত এভাবেই দুই দেশ পানি ভাগাভাগি করে নেবে। কিন্তু আগের চুক্তিগুলোতে বাংলাদেশ কখনো ৩৪,০০০ কিউসেকের কম পানি পায়নি। অতএব বোঝাই যাচ্ছে এ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ অতীতের যে কোনো চুক্তির তুলনায় কম পানি পাবে।

এতো গেলো চুক্তির কথা। প্রকৃত অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। ইন্ডিয়া টুডে লিখেছে পানি চুক্তিটা এখন একটা অর্থহীন দলীলে পরিণত হয়েছে। মার্চের শেষে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে পানির পরিমান ছিলো ৮,৫০০ কিউসেকের মতো, যদিও চুক্তি অনুযায়ী তখন বাংলাদেশ ২৯,২৮৮ কিউসেক পানি পাওয়ার কথা।

চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ফারাক্কায় পানির প্রবাহমাত্র ৫০ হাজার কিউসেকের নিচে নামলে দু'পক্ষ জরুরী বৈঠকে বসে নতুন বন্টন হার নির্ধারণ করবে এবং তা করার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশ তার প্রাপ্য পানির (যে পরিমান চুক্তিতে উল্লেখিত আছে) অন্তত ৯০% পানি পেতে থাকবে। ভারত এ অঙ্গীকারও লঙ্ঘন করেছে।

দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার ভাষ্য- Indian Dadagiri is making a mockery of the terms of the accord which was hailed as "Historic" and "Trend-setting.[১] (ভারতীয় দাদাগিরি "ঐতিহাসিক" ও "যুগান্তকারী" রূপে অভিনন্দিত চুক্তির শর্তাবলী প্রহসনে পরিণত করছে।)

১। *THE INDIAN EXPRESS*, April 6, 1997.

www.pathagar.com

১৯৯৭ সালের ১ লা এপ্রিলে ভারতের মূল চেহারা উন্মোচিত হয়। ঐদিন প্রবাহ মাত্রা ৫০ হাজার কিউসেকের নিচে নেমে আসায় চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ তার প্রাপ্য পানির(৩৫,০০০ কিউসেক) ৯০% অর্থাৎ ৩৩,০০০ কিউসেক পাওয়ার কথা। অথচ এসময় বাংলাদেশকে দেয়া হয় মাত্র ২১,০০০ কিউসক। পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে: The real arm-twisting began on April 1. The water availability had dropped further by then. Whereas the JRC. Recommended 11,842 to India and 33,000 cusecs to Bangladesh on that day, technical advisory committee really turn the tap on for India—giving itself 26,300 cusecs and Bangladesh only 21,000 cusecs.[১] [১লা এপ্রিল আসল হাত মোছড়ানো শুরু হয়। যৌথ নদী কমিশন ঐদিন বাংলাদেশকে (তার মোট প্রাপ্যের ৯০% শতাংশ অর্থাৎ) ৩৩,০০০ কিউসেক এবং ভারতকে ১১,৮৪২ কিউসেক পানি দেওয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু উপদেশক কমিটি সত্যি সত্যি ভারতের দিকে কল ঘুরিয়ে দেয়— ইন্ডিয়া নিজে নেয় ২৬,৩০০ কিউসেক আর বংলাদেশকে দেয়া হয় ২১,০০০ কিউসেক মাত্র।]

পানির প্রবাহ মাত্রা কেন কমে আসছে সে সম্পর্কে ইন্ডিয়া টুডে লিখেছে : The last few years have indeed seen a decline in the water level at Farakka. The main reason is that with as many as 400 lift irrigation points along the Ganga, Uttar Pradesh and Bihar now siphon off anything between 25,000 cusecs and 45,000 cusecs before the river reaches Frakka`. (গত কয়েক বছর ধরে ফারাক্কায় পানির প্রবাহ বাস্তবিকই কমছে। এর প্রধান কারণ হলো ফারাক্কা পর্যন্ত আসার আগেই উত্তর প্রদেশ ও বিহারে গঙ্গা নদীর ধার ধরে অন্তত চার শত পয়েন্টে সেচ কার্যের জন ২৫,০০০ কিউসেক থেকে ৪৫,০০০ কিউসেক পানি তোলা হচ্ছে।) সুতরাং ফারাক্কায় কতটুকু পানি এলো সে বিষয়ে ভারতের মাথা ব্যাথা নেই। বরং ফারাক্কায়

১। *THE INDIAN EXPRESS*, April 6, 1997

www.pathagar.com

পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার অর্থই হলো উত্তর প্রদেশ ও বিহারে বেশি পানি তোলা হচ্ছে, যা ব্যবহৃত হচ্ছে ভারতেরই স্বার্থে ।

এই হচ্ছে বর্তমান চুক্তির অবস্থা, যাতে অতীতের যে কোনো চুক্তির তুলনায় বাংলাদেশের স্বার্থ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর এখন তো চুক্তি থাকা না থাকা সমান। কারণ ভারত তার পানির প্রবাহ আগের মতই রাখছে । শুধু গঙ্গা নয়, ভারত-বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি নদীর মধ্যে ভারত ৫১টিতেই বাঁধ দিয়ে পানি সরিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশের একেবারে অস্থিত্বে আঘাত হানছে। এরপর যদি কেউ এসব সমস্যার সমাধানের আগেই দু'দেশের সুসম্পর্কের আশা করে তা হলে তা হবে একটা কথার কথা মাত্র।

একইভাবে ভারত ট্রানজিট নিয়েও বাংলাদেশকে চাপের মুখে রেখেছে। ভারত প্রথমে ট্রানজিটকে পানির সাথে জড়িয়ে সুবিধা নিতে চেয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রানজিট সুবিধা আছে। কিন্তু তাদের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। অর্থনৈতিক অবস্থাও ভিন্ন। আর সেখানে দুই দেশের পারস্পরিক সুবিধার কথা বিচেনা করেই ট্রানজিট চালু হয়েছে। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট চায় শুধু নিজের অর্থনৈতিক-সামরিক সুবিধা অর্জনের জন্যে।

ভারতের ট্রানজিটের অন্যতম লক্ষ্য যে, পূর্বাঞ্চলের সাতটি প্রদেশের বিদ্রোহ দমন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেনা বাহিনী ও সরঞ্জাম আনা নেয়ার সুবিধার জন্যই ভারত ট্রানজিট চায়। এতে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর কাঁচামাল পশ্চিমে সরিয়ে নেয়ার একটা সহজ সুযোগও তৈরি হবে। আর এজন্যই ভারত শুরু থেকে এসকাপের পরিকল্পনা এশিয়ান হাইওয়ের সাথে বিষয়টিকে জড়িয়ে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করছে।

প্রথমে এশিয়ান হাইওয়ের পরিকল্পনা ছিলো সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা হয়ে চট্টগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ঢাকা, কলকাতা, দিল্লী পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্কের মধ্যে দিয়ে ইউরোপের সাথে সংযোগ সাধন। বিগত বি. এন. পি. সরকারের আমলে, ১৯৯৩ সালের

www.pathagar.com

এসকাপের দিল্লী বৈঠকে এশিয়ান হাইওয়ের রুট পরিবর্তন করে ঠিক করা হয় দিল্লী-কলকাতা থেকে একটি রুট ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম আবার দিল্লী-কাঠমন্ডু-দার্জিলিঙ-পঞ্চগড়-ঢাকা-সিলেট হয়ে আরেকটি রুট আসাম নাগ্যাল্যান্ড মিজোরাম ইত্যাদি হয়ে রেঙ্গুন যাবে। এতে ঢাকার সাথে রেঙ্গুনের সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকবে না। অন্যদিকে, ভারত এশিয়ান হাইওয়ের মাধ্যমেই পূর্বাঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধাও পাবে। বাংলাদেশকে ভারতের মধ্য দিয়েই অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

ভারতের এ উদ্দেশ্যকে বাংলাদেশের মানুষ স্বাগত জানাতে পারে না। পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি প্রদেশের মানুষের সাথে বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ট। পাকিস্তান আমলে পূর্ব সীমান্তে অর্থাৎ বাংলাদেশের সাথে ভারতের কখনো বড় ধরনের ঝামলা হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এ সাতটি প্রদেশ বাংলাদেশের মানুষদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছে। যে কারণে বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আলাদা হয়ে গেছে ঠিক একই কারণে এই সাতটি প্রদেশও ভারতের কবল থেকে স্বাধীন হওয়ার সংগ্রাম করছে। শর্তহীন ট্রানিজিট-চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের সেনাবাহিনী যাতায়তের সুযোগ দিয়ে পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রাম বাংলাদেশের মাটিতে টেনে আনার চেষ্টাকে সমর্থন করা যায় না। তা করলে অচিরেই বাংলাদেশের শান্তি চিরতরে বিনষ্ট হবে। তাছাড়া নৈতিক কারনে আমরা কোনো জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে বাধা দিতে পারি না। অথচ কিছুদিন থেকে তা-ই ঘটছে।

পত্র-পত্রিকায় খবর পাওয়া যাচ্ছে যে পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশের পুলিশ-বি ডি আর আর ভারতের বিএসএফ মিলে গেরিলাদের বিরুদ্ধে নেমেছে। সিলেটে বসবাসকারী উপজাতীয় নাগরিকদের ওপর নজর রাখার নামে তাদেরকে হয়রানী হরা হচ্ছে। এ কারনে বাংলাদেশের পুলিশদের ওপর গেরিলাদের হামলা, বাংলাদেশের মাটিতে গেরিলাদের গ্রেফতার ইত্যাদি ঘটছে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের এসব পদক্ষেপ যে বাংলাদেশের মানুষকে ভারত বিরোধী এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী করে তুলবে তাতে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় ভারতের প্রকৃত-উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশকে কোনো না কোনো ভাবে বেকায়দায় ফেলে রাখা। ভারতের এই মনোবৃত্তি পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সম্পর্ককে মারাত্মভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এসব ক্ষতের শুশ্রুষা না করে শধু মুখে মুখে দু'দেশের সুসম্পর্কে কথা বলে বেড়ানোর কোনো অর্থ যে নেই তা আমরা গত দু'দশক ধরেই দেখছি।

www.pathagar.com

প্রচারযন্ত্র ও বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা

শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং প্রচারযন্ত্রের একাংশ খুব ঘৃণ্যভাবে সাধারণ মানুষের আবেগ ও স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যাবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশে তো পরিস্থিতি আরো খারাপ। মৌলবাদীরা তাদের নিজেদের প্রচারযন্ত্র গড়ে তোলে তার মাধ্যমে জনমত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। অন্যান্য পথের অনুসারীরাও নিজেদের পত্রপত্রিকা নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করে। কিন্তু যা বিপদজনক তা হলো অনেক সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী সামান্য ব্যাক্তিগত স্বার্থের লোভে প্রচারযন্ত্র ও কলমকে ব্যবহার করছেন, এমনকি তাতে জাতীয় স্বার্থ মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকলেও। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ তথা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নষ্টের জন্য এসব বুদ্ধিজীবী ও প্রেসের স্বার্থপর তৎপরতাও অনেকাংশে দায়ী। আমি এখানে শুধু বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী ও প্রেসের ভূমিকাই আলোচনা করবো।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে প্রচার মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীতে মারাত্মক কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বি.এন.পি ও এরশাদের আমলে হঠাৎ গজিয়ে ওঠে প্রচুরসংখ্যক পয়সাঅলা। এদের কেউ কেউ পত্রপত্রিকা এবং প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করে : সম্ভবত দুটো কারণে—কালো টাকাকে শাদা করার জন্য এবং রাতারাতি নাম ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য। যে দেশে সরকারের ছায়ায় থেকে নিয়মিত অপরাধ করে যায় রাজনীতিবিদ ও আমলারা, সে দেশে প্রচার মাধ্যমের একটি বিশেষ ক্ষমতা থাকে। গত দুই দশকে বাংলাদেশে অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার একটি কারণ এই ক্ষমতার লোভ।

www.pathagar.com

এখানে এমন অনেক পত্রিকা আছে যার চেহারা বছরে এক কি দু'বার দেখা যায়।

এসব পত্রিকার মাধ্যমে তৈরী হয়েছে এক শ্রেণীর নব্য বুদ্ধিজীবী। এদের চিন্তা যেহেতু অসৎ ও অক্ষম, ফলে লেখার ক্ষমতাও ততোধিক দুর্বল। সে কারণে এরা গণমানসের জন্য উত্তেজক সমসাময়িক বিষয়ের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা' এদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি বিষয়। কারণ এ বিষয়ে লিখে বা বিতর্কিত কথা বলে শুধু যে দেশজোড়া পরিচিতি আসে তাই নয়, সংখ্যালঘু বাংলাদেশী হিন্দুদের পক্ষে যায় অথবা বাংলাদেশ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যায় এমন সব কল্পিত তথ্য ও ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারলে পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাপক পরিচিতি ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়। এরা মনে করে পশ্চিমবঙ্গের দাদাদের সম্পর্কে লিখলেও ওখানে অন্তত নামটা প্রচার হবে সহজেই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ ধরণের কর্মকান্ডে উৎসাহ দেয়ার ফলে এদের সংখ্যা ও তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার এর উল্টোটাও সত্যি। অর্থাৎ ভারতের বিরুদ্ধে লিখেও বাংলাদেশের মৌলবাদী বৃত্তে নানা সুবিধা অর্জন করা যায়, যদিও এ সুবিধার পরিমান পূর্বোক্ত সুবিধার তুলনায় খুবই কম।

এভাবে বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের দুটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে। দুটি শ্রেণীর উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা একই রকম, চরিত্রও এক। এরা তথ্য কিংবা তার ব্যবহার বিকৃত করে, তথ্য কল্পনা ও তৈরী করে, বাস্তব ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা দেয়, ঘটনার পটভূমি পাল্টে দিয়ে তার উদ্দেশ্য ও অভিমূখ বিকৃত করে, এবং এভাবে গণমানসে ভুল আবেগ ও উত্তেজনার বিস্তৃতি ঘটায়, বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে। পিঠ বাঁচাবার জন্য এরা দুটো রাজনৈতিক গ্রুপের আশ্রয় নিয়ে থাকে। ভারত-বিরোধী দলটি জামাতের সাথে মিশে থাকে বলে এরা চিহ্নিত, সে কারণে ততটা বিপদজনকও নয়। আর, বাংলাদেশের হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছে বলে প্রচার চালায় যারা তারা এখানে 'বামপন্থী মুখোশ'ধারী গোষ্ঠীটির আশ্রয়ে আছে। এ কারণেই এ দলটি বিপদজনক। এরা সংখ্যায় বেশি, কারণ লাভের পরিমাণটাও বেশি। এরা এমন একটি গ্রুপের নাম নিয়ে আছে যে গ্রুপটির প্রতি সচেতন শিক্ষিত মানুষের কারো

www.pathagar.com

কারো আস্থা আছে । এ কারণে ধ্বংসের সামর্থ্যটাও এদের বেশি। বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়া সম্ভব নয় বলে আমি দু'একটি উদাহরণ দেব।

বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে তসলিমা নাসরীন যা করেছে সে বিষয়ে আগে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়বার তার প্রসঙ্গ টানা অবান্তর। মজার ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশে তসলিমার সংখ্যা বাড়ছে। কিছুদিন আগে দৈনিক ভোরের কাগজে আবেদ খাঁন নামের এক কলামিষ্ট "বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতা" শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছেন।[১] তার কথাবার্তাও ঐ 'তসলিমা' ধরণের। তার লেখার মূল বক্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রদায়িক, হিন্দুদের অধিকার ক্ষুন্ন করছে, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা লাগিয়েছে এবং বাংলাদেশকে পাকিস্তানে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। লক্ষ্যনীয় যে মৌলবাদীদের আশ্রয়ে লালিত 'সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী'দের চিন্তা ধারার সাথে তার চিন্তা ভাবনার গভীর সাদৃশ্য আছে। ঐ পক্ষের বক্তব্য হলো আওয়ামী লীগ এবং বামপন্থীরা বাংলাদেশকে ভারতে পরিণত করতে চায়। দু'পক্ষের মিলটা হচ্ছে এই 'বাংলাদেশকে অমুক দেশে পরিণত করতে চাওয়া'র মধ্যে। যেন একদল আরেকদলের উল্টোছবি। তো, এই দেশপ্রেমী আবেদ খাঁন ভারতের এক সাংবাদিকের গ্রন্থের উদ্ধৃতি টেনে লিখেছেন:

সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সংকট গ্রন্থে কঙ্কর সিংহ পাকিস্তানী মন্ত্রী মাহমুদ আলীর একটি উল্লসিত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: 'পাকিস্তানের সাথে পূর্বশাখার যোগসূত্র সম্ভব হবে এবং পূর্ব শাখা পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হবে।' *বাংলাদেশের পঁচাত্তর পরবর্তী সরকার সমূহ এই চেষ্টাই করেছে ..... ।*

বাংলাদেশের পঁচাত্তর পরবর্তী সরকার সমূহ অর্থাৎ জিয়াউর রহমান, বিচারপতি সাত্তার, এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার সরকার বাংলাদেশকে পাকিস্তানে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়েছে বলে দাবী করেছেন লেখক, কিন্তু কোনো তথ্য প্রমাণ উল্লেখ করেননি। তিনি '৯০ সালের হিন্দু-মুসলিম সংঘাত সম্পর্কে লিখেছেন:

---

১. দৈনিক ভোরের কাগজ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৯৭

www.pathagar.com

এরশাদ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পর্যন্ত বাধানোর সাহস পেয়েছেন, অসংখ্য মন্দির মাটিতে গুঁড়িয়ে দিয়ে এদেশের মাটিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বসবাসের অযোগ্য করেছেন।

এর অর্থ হচ্ছে আবেদ সাহেব মনে করেন এরশাদের সময়ের হিন্দু-মুসলিম সংঘাতে বাবরী মসজিদের ঘটনা কোনো প্রভাব ফেলেনি, মৌলবাদী এবং কিছু দূর্বৃত্ত মুসলামানদের দিয়ে এরশাদ সাহেব মারামারি বাধিয়েছিলেন।

আরেকজন সাংবাদিকের কথা উল্লেখ করা যায়। তার নাম শাহরিয়ার কবীর। রচিত গ্রন্থের সংখ্যার দিক থেকে তিনি অনেক বড় বড় লেখকেরও 'উপরে' আছেন। তিনি বই 'রচনা' করেছেন তিরিশটির মতো। এর মধ্যে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা— মূলত: ১৯৯০ ও '৯২ সালে বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা নিয়ে—তিনি দুটি বই লিখেছেন। তার বইয়ে অনক ভূল তথ্য আছে, আছে মারাত্মক তথ্য বিকৃতি। আমি শূধু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তথ্য-বিকৃতির নমুনা তুলে ধরবো।

এরশাদ সরকার কর্তৃক ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষনা দেয়ার পরবর্তী সময় সম্পর্কে শাহরিয়ার কবির লিখেছেন:

" সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বিলুপ্ত হওয়ার পর দেশের হিন্দু সম্প্রদায় যারা মোট জনসংখ্যার ১৫%, যথেষ্ট শঙ্কার ভেতর দিনযাপন করছিলেন। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষনার পর তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্ব আরও বিপন্ন হলো। গ্রামাঞ্চলের মোড়ল মাস্তানদের উৎপাতে তাদের অনেকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। যারা দেশে থাকলেন তারাও প্রকারান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হলেন। হিন্দুদের মতো খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধরাও নিজেদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ভাবতে বাধ্য হলেন। প্রশাসনের উচ্চপদে বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে তাদের প্রবেশাধিকার যদিও আগে যথেষ্ট সঙ্কুচিত ছিলো, রাষ্ট্রধর্ম আইন পাশ হওয়ার পর সেটা বলতে গেলে একরকম বিলুপ্তই হয়ে গেল।" [১]

তার এই ভাষণ সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ সত্য নয়। বাংলাদেশে হিন্দুসম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার ১০.৫%। এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম আইন বাংলাদেশে কোনো প্রভাবই

১। শাহরিয়ার কবির, *বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়*, পৃ ১৭-১৮।

www.pathagar.com

ফেলতে পারেনি। এর আগে যেমন ছিলো আমাদের ধর্মীয় জীবন এখনো তেমনই আছে। তার কারণ হলো এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষনা আসলে ছিলো একটা ভাণ। ফলে এর কোনো প্রভাব কোথাও পড়েনি। লেখকের কল্পনা আরো অগ্রসর হয়ে যখন এর সাথে সেনাবাহিনীতে হিন্দুদের চাকুরীর বিষয়টি যুক্ত করে তখন বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। অথচ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস এবং পুলিশ বিভাগে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন হিন্দু নাগরিকরা।

১৯৯২ সালের ডিসম্বরে ভারতে উগ্র হিন্দু মৌলবাদীরা ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেললে বাংলাদেশে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কয়েকটি স্থানে মুসলমান নামধারী কিছু দুর্বৃত্ত হিন্দুদের মন্দির ও বাড়ি-ঘর-দোকানপাটে হামলা চালিয়ে ক্ষয়ক্ষতি করে। কিন্তু সরকারের এবং সর্বস্তরের সচেতন নাগরিকদের ত্বরিৎ পদক্ষেপে পতিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। বহু জেলায় কারফিউ জারী করা হয়। অধিকাংশ হিন্দু গ্রামে সাময়িক পুলিশ ও বিডিআর ক্যাম্প বসে।

ঐ সময়ের ঘটনা সম্পর্কে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষেদের নামে লেখক যে তথ্য দিয়েছেন তাতে অবাক হতে হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সময় ২৪০০ হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়, ২৮০০০ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, মন্দির ভাঙ্গে ৩৬০০টি।[১] এ তথ্যগুলোকে শুধু বিকৃত বললে শেষ হয় না, উল্লেখিত সংখ্যাগুলো প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে এতোগুন বেশি যে তার উল্লেখিত পরিসংখ্যানকে একটি জলজ্যান্ত মিথ্যা না বলে উপায় থাকে না। বাংলাদেশের যে কোনো সাধারণ নিরপেক্ষ মানুষই বলতে পারবেন শাহরিয়ার কবির কতো বড় মিথ্যার ইতিহাস ফেঁদেছেন। অন্যদিকে, প্রশাসনের উচ্চ পদে নিয়োগ প্রাপ্তির ব্যাপারে ভারতের মুসলমানদের চেয়ে বাংলাদেশের হিন্দুরা যে বেশি সুবিধা ভোগ করে তাও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে এখনো বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন অনেক দক্ষ হিন্দু কর্মকর্তা। বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়, পুলিশ বিভাগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রচুর হিন্দু

১। শাহরিয়ার কবির, পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

নাগরিক আছেন। একটি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হলো প্রচার মাধ্যম। বাংলাদেশে প্রচার মাধ্যমের চালনকেন্দ্রেও নবীন প্রবীন হিন্দু নাগরিকরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি আরো লিখেছেন, *'৯২-এর নৃশংস ঘটনাবলীর পর বিপন্ন হিন্দু সম্প্রদায় তাদের বাড়িঘর ফেলে কখনো বা নামমাত্র দামে বিক্রি করে গোপনে দেশ ত্যাগ করেন। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ভোলা জেলায় এক সরজমিন তদন্তে এই লেখক প্রতক্ষ করেছেন সেখানকার ২৫% থেকে ৩০% হিন্দু জনসংখ্যা দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে গেছেন।*

বি.এন.পি সরকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির আরও পরিচয় পাওয়া যাবে হিন্দুদের প্রতি চাকুরী ও ব্যবসাক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণে। ১৯৯২-এর নভেম্বর-এ সরকার এক গোপন সার্কুলারে হিন্দু ব্যবসায়ীদের ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ এবং তাদের ফিক্সড ডিপোজিট থেকে টাকা তোলার ব্যাপারেও বিধি নিষেধ আরোপ করে।'[১]

সরকারের কোনো গোপন সার্কুলারের কথা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে আমরা জানি অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশেও সরকারে কোনো গোপন তথ্যই গোপন থাকে না। হিন্দুদের ব্যবসা এবং চাকুরীর বিষয়ে বাস্তব তথ্য আমার জানা আছে। এটা নিরেট বাস্তব যে, ঢাকা ছাড়া প্রতিটি মফস্বল শহরসহ অন্যান্য হাটবাজারে হিন্দু ব্যবায়ীরা অনেক আগে থেকে এখন পর্যন্ত একচেটিয়া ব্যবসা করছে। এর কারণ হলো হিন্দুরা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতই দামে ঠকায় কিন্তু জিনিসের গুনগত মান ঠিক রাখার চেষ্টা করে। আর অধিকাংশ মুসলমান ব্যবসায়ী দামে এবং গুনে দুদিকেই পুকুর চুরির চেষ্টা করে। কারণ তারা এই হালে ব্যবসা শিখেছে।

শাহরিয়ারের উক্ত দুটি বইয়ে এরকম অসংখ্য বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। শাহরিয়াররা হয়তো এসব কাজ করেছেন তসলিমা নাসরীনের পুরষ্কৃত হওয়ার ঘটনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। কিন্তু তাদের এ প্রোপাগান্ডা ভারতের হিন্দু প্রধান অঞ্চলে দাঙ্গা লাগিয়ে দিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাদের এসব মিথ্যা

১। শাহরিয়ার কবির, পূর্বোক্ত, পৃ-২১।

www.pathagar.com

তথ্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের যে প্ররোচিত করবে এবং হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যে তা ব্যবহারের চেষ্টা করবে তাই তো স্বাভাবিক।

বস্তুত: এ সময়ের বুদ্ধিজীবী মহল (দু'বাংলার বুদ্ধিজীবীরাই) অসৎ বলে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে যতবার দাঙ্গার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে ততবার সাথে সাথে বুদ্ধিজীবীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তা প্রতিরোধ করেছেন। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে দাঙ্গা দমন করেছে। এখন কখনো দাঙ্গার সম্ভাবনা দেখা দিলে বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদী অংশ (যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ) ঘরে বসে থাকেন। এবং ঘরে বসে বসে চিন্তা করেন কিভাবে এ সংঘর্ষের ওপর মিথ্যার রঙ চড়িয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে দুই বাংলায় নাম কেনা যাবে, নানা সুবিধা ভোগ করা যাবে। বিশেষত বাংলাদেশে এ কথাটা অত্যন্ত সত্যি। কারণ এখানে যে পরিমান মুসলমান ভারতের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে কাজে লাগিয়ে হিন্দুদের উপর সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে তার চেয়ে 'বিপ্লবী ও প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা অনেক বেশি। এরা নিষ্ক্রিয় এবং সুবিধাবাদী বলেই দুর্বৃত্ত কিছু মুসলমান সুযোগ পায়। এরা মুসলমান না হয়ে অন্য কোনো জাতের লোক হলেও এ ধরণের সুযোগের সন্ধানে থাকতো। এদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা শধু কাগজে কলমে কথা বলে ফায়দা লুটেন বলেই এরা নিশ্চিহ্ন হচ্ছে না। দু:খের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর তরফ থেকে এসব বুদ্ধিজীবীদেরকেই বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়। এ কারণে পুরো প্রক্রিয়াটি এখনো অব্যাহত থাকতে পারছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা পূর্বের তুলনায় বেড়ে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ হলো ভারতে হিন্দু মৌলবাদের ভয়াবহ বিস্তার এবং সংখ্যালঘুদের ওপর তাদের অন্যায়-অবিচার। এর প্রতিক্রিয়াতে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রভাব ফেলছে। ওখানে সাম্প্রদায়িকতা যতো বাড়ছে ততো কঠিন হয়ে উঠছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি। এই ধারা অব্যাহত থাকলে এক সময় হয়তো, ভারতের মতোই, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। কাজেই এ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে দুই দেশের মৌলবাদীদের ওপর এখনই কঠোর আঘাত হানা উচিত।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্ক কতটা বিদ্বেষ-মূলক এবং জটিল তার আভাস পাওয়া যাবে উপরের অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে। কিন্তু সমস্যা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর বাইরে ছোটো খাটো বিষয় থেকে যায় যা দুটো দেশের সম্পর্ককে ভঙ্গুর করে তুলতে পারে।

এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজনীতি দুই বাংলার বিচ্ছেদের জন্য অনেকাংশে দায়ী। দুই বাংলার সুসম্পর্কে রাজনীতিবিদদের স্বার্থ নেই। তাই রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে উদ্যোগটা শূরু না হয়ে যদি সাধারণের মধ্য থেকে শূরু হয় তাহলে তা ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভবনা থাকে এবং এতে ফলাফলটাও দীর্ঘস্থায়ী হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দু'বাংলার সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারলে রাজনৈতিক পালাবদলের কাজটা এমনিতেই সহজ হয়ে যাবে।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সম্পর্কের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায় কম বা বেশি দু'দিকেই বর্তায়। তাই পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করে লাভ নেই। আমাদের উচিত প্রথমেই এই ব্যবধানের জন্য দায়ী উপাদানগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণের চেষ্টা চালানো। এতোক্ষণ ধরে দু'দিকের ত্রুটিগুলো যে আমি তুলে ধরলাম তার কারণ হলো আমরা চাই দুই বাংলার মধ্যে একটি সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক। দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার স্বার্থেই আমাদের পরস্পরের খুঁতগুলো খুঁজে বের করে সেসব দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

---

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ও ২য় খন্ড,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,* সুভাষ মুখোপাধ্যায়কৃত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* জেনারেল, কলকাতা ।

৪. এবনে গোলাম সামাদ, *নৃতত্ত্ব,* বাঙলা একাডেমী।

৫. পুলক চন্দ, *ইতিহাস সাম্প্রদায়িকতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র,* লেখনী প্রকাশনী, কলকাতা।

৬. আব্দুল মান্নান, *মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা,* সৃজন প্রকাশনী লি.।

৭. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস,* বাংলা একাডেমী।

৮. চর্যাপদ।

৯. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, *প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শন: উয়ারী-বটেশ্বর,* গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী।

১০. রবিশঙ্কর, *রাগ অনুরাগ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

১১. সৈয়দ আলী আহসান, *আমার সাক্ষ্য,* বাড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

১২. আবু রিদা, *তসলিমা নাসরীন: জীবনবোধ ও যৌনচেতনা,* কলকাতা।

১৩. খালেকুজ্জামান, *ট্রানজিট হাইওয়ে বিতর্ক, পানিচুক্তি ও বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক,* বাসদ।

১৪. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।*

১৫. *দৈনিক আজকের কাগজ,* ঢাকা।

১৬. *সাপ্তাহিক নতুন গতি,* কোলকাতা।

১৭. Benjzmin Walker, *Hindu World*, George Allen & Unwin Ltd. London.

www.pathagar.com

১৮. Sonia Cole, *Races of Man,* British Museum.
১৯. Rama Prasad Chanda, *The Indo-Arayan Races,* Rajshahi Varendra Research Siciety.
২০. Romila Thapar, *A History of India 1,* Penguin.
২১. *INDIA RODAY.*
২২. *THE INDIAN EXPRESS.*

www.pathagar.com

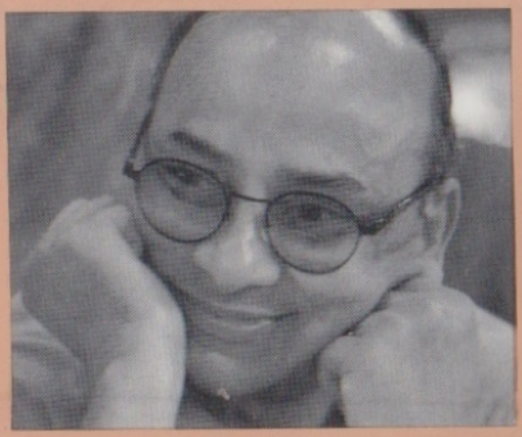

অনেকদিন থেকেই লিখছেন ওবেইদ জাগীরদার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ নিবন্ধ, ইতিহাস ও সমকালীন সমাজ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনা এরই মধ্যে প্রাজ্ঞজনদের দৃষ্টি কেড়েছে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ: *চেঙ্গিস খানের মঙ্গোলিয়া*, *মুক্তির অন্বেষায় মধ্য এশিয়া*, *বসনিয়া-পশ্চিমের বিবেক* ইত্যাদি।